আন্ নাহ্ল

১৬

নামকরণ

৬৮ আয়াতের وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ বাক্যাংশ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এও নিছক আলামত ভিত্তিক, নয়তো নাহ্ল বা মৌমাছি এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য–প্রমাণ এর নাযিল হওয়ার সময়–কালের ওপর আলোকপাত করে। যেমন,

৪১ আয়াতের وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوْا বাক্যাংশ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সময় হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১০৬ আয়াতের مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِه বাক্য থেকে জানা যায়, এ সময় জুলুম–নিপীড়নের কঠোরতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল এবং এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি নির্যাতনের আধিক্যে বাধ্য হয়ে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কি হবে।

১১২–১১৪ আয়াতগুলোর – ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً .... اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ বাক্যগুলো পরিষ্কার এদিকে ইংগিত করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এ সূরার ১১৫ আয়াতটি এমন একটি আয়াত যার বরাত দেয়া হয়েছে সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে। আবার সূরা আন'আমের ১৪৬ আয়াতে এ সূরার ১১৮ আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সূরা দুটির নাযিলের মাঝখানে খুব কম সময়ের ব্যবধান ছিল।

এসব সাক্ষ–প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগীও একথা সমর্থন করে।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

শিরককে বাতিল করে দেয়া, তাওহীদকে সপ্রমাণ করা, নবীর আহবানে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও

তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

আলোচনা

কোন ভূমিকা ছাড়াই আকস্মিকভাবে একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে সূরার সূচনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা বারবার বলতো, "আমরা যখন তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করছি তখন তুমি আমাদের আল্লাহর যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আসছে না কেন?" তাদের এ কথাটি বারবার বলার কারণ ছিল এই যে, তাদের মতে এটিই ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী না হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, নির্বোধের দল, আল্লাহর আযাব তো তোমাদের মাথার ওপর একেবারে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তা কেন দ্রুত তোমাদের ওপর নেমে পড়ছে না এ জন্য হৈ চৈ করো না। বরং তোমরা যে সামান্য অবকাশ পাচ্ছো তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এরপর সংগে সংগেই বুঝাবার জন্য ভাষণ দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু একের পর এক একাধিকবার সামনে আসতে শুরু করেছে।

(১) হৃদয়গ্রাহী যুক্তি এবং জগত ও জীবনের নিদর্শনসমূহের সুস্পষ্ট সাক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিথ্যা এবং তাওহীদই সত্য।

(২) অস্বীকারকারীদের সন্দেহ, সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার প্রত্যেকটির জবাব দেয়া হয়েছে।

(৩) মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোয়ার্তুমি এবং সত্যের মোকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা এনেছেন, মানুষের জীবনে যে সব নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেগুলো সংক্ষেপে কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তারা যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেবার দাবী করে থাকে এটা নিছক বাহ্যিক ও অন্তসারশূন্য দাবী নয় বরং এর বেশ কিছু চাহিদাও রয়েছে। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক-চারিত্রিক ও বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রকাশ হওয়া উচিত।

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথীদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয়েছে এবং সংগে সংগে কাফেরদের বিরোধিতা, প্রতিরোধ সৃষ্টি ও জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি কি হতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

أَتَىٰٓ أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ① يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ أَنْ أَنْذِرُوْٓا أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُوْنِ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ③

এসে গেছে আল্লাহর ফায়সালা।[১] এখন আর একে ত্বরান্বিত করতে বলো না। পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করছে তার উর্ধে তিনি অবস্থান করেন।[২] তিনি এ রূহকে[৩] তাঁর নির্দেশানুসারে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর চান নাযিল করেন।[৪] (এ হেদায়াত সহকারে যে, লোকদের) "জানিয়ে দাও, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো"[৫] তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। এরা যে শিরক করছে তাঁর অবস্থান তার অনেক উর্ধে।[৬]

১. অর্থাৎ তা একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। তার প্রকাশ ও প্রয়োগের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। ব্যাপারটা একেবারেই অবধারিত ও সুনিশ্চিত অথবা একান্ত নিকটবর্তী এ ধারণা দেবার জন্য ব্যাক্যটি অতীতকালের ক্রিয়াপদের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। কিংবা কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সবরের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল এবং শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছিল বলেই অতীতকালের ক্রিয়াপদ দ্বারা একথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন জাগে, এ "ফায়সালা" কি ছিল এবং কোন্ আকৃতিতে এসেছে? আমরা মনে করি (তবে আল্লাহই সঠিক খবর ভাল জানেন) এ ফায়সালা বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে হিজরতকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিলের কিছুদিন পরেই এ হিজরতের হুকুম দেয়া হয়। কুরআন অধ্যয়নে জানা যায়, যে সমাজে নবীর আগমন ঘটে তাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান একেবারে শেষ সীমানায় পৌছে গেলেই নবীকে হিজরতের

হুকুম দেয়া হয়। এ হুকুম উল্লেখিত সমাজের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। এরপর হয় তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক আযাব এসে যায় অথবা নবী ও তাঁর অনুসারীদের হাত দিয়ে তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়া হয়। ইতিহাস থেকেও একথাই জানা যায়। হিজরত সংঘটিত হবার পর মক্কার কাফেররা মনে করলো ফায়সালা তাদের পক্ষেই হয়েছে। কিন্তু আট দশ বছরের মধ্যেই দুনিয়াবাসীরা দেখে নিল, শুধুমাত্র মক্কা থেকেই নয়, সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকেই শিরক ও কুফরীকে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে।

২. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করার জন্য এর পটভূমি সামনে রাখা প্রয়োজন। কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছিল যে, তুমি আল্লাহর যে ফায়সালার কথা বলে আমাদের ভয় দেখিয়ে থাকো তা আসছে না কেন? তাদের এ চ্যালেঞ্জের পিছনে আসলে যে চিন্তাটি সক্রিয় ছিল তা ছিল এই যে, তাদের মুশরিকী ধর্মই সত্য এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খামাখা আল্লাহর নামে একটি ভ্রান্ত ধর্ম পেশ করছেন। আল্লাহ এ ধর্মকে অনুমোদন দান করেননি। তাদের যুক্তি ছিল, আমরা যদি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকি এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর পাঠানো নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করছি তাতে আমাদের সর্বনাশ হওয়া উচিত ছিল না কি? কিন্তু তা হচ্ছে না, এটা কেমন করে সম্ভব? তাই আল্লাহর ফায়সালার ঘোষণা দেবার সাথে সাথেই বলা হয়েছে, এ ফায়সালার প্রয়োগ বিলম্বিত হবার যে কারণ তোমরা মনে করছো তা মোটেই সঠিক নয়। আল্লাহর সাথে কারো শরীক হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সত্তা এর অনেক উর্ধে এবং এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

৩. অর্থাৎ নবুওয়াতের রূহ। এ রূহ বা প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হয়েই নবী কাজ করেন ও কথা বলেন। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবনে প্রাণের যে মর্যাদা এ অহী ও নবুওয়াতী প্রাণসত্তা নৈতিক জীবনে সেই একই মর্যাদার অধিকারী। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার জন্য 'রূহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ সত্যটি না বুঝার কারণে ঈসায়ীগণ রূহুল কদুস (Holy Ghost)-কে তিন খোদার এক খোদা বানিয়ে নিয়েছেন।

৪. ফায়সালা কার্যকর করাবার দাবী জানিয়ে কাফেররা যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল তার পেছনে যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের অস্বীকৃতিও কার্যকর ছিল, তাই শিরক খণ্ডনের পরপরই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা বলতো, এ ব্যক্তি যা বলছে, এসব মিথ্যা ও বানোয়াট। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন, এ ব্যক্তি হচ্ছে আমার পাঠানো রূহ। এ রূহ ও প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়েই সে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করছে।

তারপর তিনি যে বান্দার ওপর চান এ রূহ নাযিল করেন —একথার মাধ্যমে নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে উত্থাপিত কাফেরদের একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কাফেররা আপত্তি করে বলতো, আল্লাহর যদি নবী পাঠাবার দরকার হয়ে থাকে তাহলে কেবলমাত্র আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদই (সা) কি এ কাজের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিল? মক্কা ও তায়েফের সমস্ত বড় বড় সরদাররা কি মরে গিয়েছিল? তাদের কারোর ওপর আল্লাহর দৃষ্টি পড়েনি? এ ধরনের অর্থহীন ও অযৌক্তিক আপত্তির জবাব এ ছাড়া আর কি হতে পারতো? এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর এ জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿৪﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا
لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿৫﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿৬﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ
لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿৭﴾ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿৮﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿৯﴾

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ছোট্ট একটি ফোঁটা থেকে। তারপর দেখতে দেখতে সে এক কলহপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।[৭] *তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পোশাক, খাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ উপকারিতাও। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য যখন সকালে তোমরা তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠাও এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনো। তারা তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে এমন সব জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রম না করে পৌঁছুতে পারো না। আসলে তোমার রব বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়। তোমাদের আরোহণ করার এবং তোমাদের জীবনের শোভা–সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (তোমাদের উপকারার্থে) আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো তোমরা জানোই না।*[৮] *আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে।*[৯] *তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্য–সোজা পথে পরিচালিত করতেন।*[১০]

আল্লাহ নিজের কাজ সম্পর্কে নিজেই অবগত আছেন। তাঁর কাজের ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে তাঁর পরামর্শ নেবার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই সংগত মনে করেন নিজের কাজের জন্য নির্বাচিত করে নেন।

৫. এই বাক্যের মাধ্যমে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, নবুওয়াতের রূহ যেখানেই যে ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সেখানেই তিনি এ একটিই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন যে, সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং একমাত্র তাঁকেই

ভয় করতে হবে, তিনি একাই এর হকদার। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন সত্তা নেই যার অসন্তুষ্টির ভয়, যার শাস্তির আশংকা এবং যার নাফরমানির অশুভ পরিণামের আতংক মানবিক চরিত্র ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রক এবং মানবিক চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

৬. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী যে শির্ক পরিহার করার এবং তাওহীদ বিশ্বাসী হবার দাওয়াত দেন, পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র সৃষ্টি কারখানাই তার সাক্ষ দিয়ে চলছে। এ কারখানা কোন কাল্পনিক গোলক ধাঁধাঁ নয় বরং একটি পুরোপুরি বাস্তব সত্য ব্যবস্থা। এর যেদিকে ইচ্ছা তাকিয়ে দেখো কোথাও থেকে শির্কের সাক্ষ–প্রমাণ পাওয়া যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোথাও প্রতিষ্ঠিত দেখা যাবে না। কোন বস্তুর গঠন প্রণালী একথা প্রমাণ করবে না যে, তার অস্তিত্ব অন্য কারোর দান। কাজেই যেখানে এ বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নির্ভেজাল তাওহীদের নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে সেখানে তোমার এ শির্কের চিন্তাধারা—যার মধ্যে ধারণা ও অনুমান ছাড়া বাস্তব সত্যের গন্ধমাত্রও নেই—কোথায় জারী হতে পারে? এরপর বিশ্বজগতের নিদর্শনাবলী এবং স্বয়ং মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে এমন সব সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করা হয় যা একদিকে তাওহীদ এবং অন্যদিকে রিসালাতের প্রমাণ পেশ করে।

৭. এর দুই অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত এখানে এ দুই অর্থই প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ একটি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে এমন মানুষ তৈরী করেছেন যে বিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন করার যোগ্যতা রাখে এবং নিজের বক্তব্য ও দাবীর পক্ষে সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যে মানুষকে আল্লাহ শুক্রবিন্দুর মত নগণ্য জিনিস থেকে তৈরী করেছেন তার অহংকারের বাড়াবাড়িটা দেখো, সে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মোকাবিলায় নিজেকে পেশ করার জন্য বিতর্কে নেমে এসেছে। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে সামনের দিকে একের পর এক কয়েকটি আয়াতে যে দলীল পেশ করা হয়েছে এ আয়াতটি তারই একটি সূত্র। (এ বর্ণনা ধারার শেষ পর্যায়ে আমরা এর ব্যাখ্যা করবো) আর দ্বিতীয় অর্থটির প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয় যে, বড় বড় বুলি আওড়ানোর আগে নিজের সত্তার দিকে একবার তাকাও। কোন্ আকারে কোথা থেকে বের হয়ে তুমি কোথায় এসে পৌঁছেছো? কোথায় তোমার প্রতিপালনের সূচনা হয়েছিল? তারপর কোন্ পথ দিয়ে বের হয়ে তুমি দুনিয়ায় এসেছো? তারপর কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করে তুমি যৌবন বয়সে পৌঁছেছো এবং এখন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে কার মুখের ওপর কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছো?

৮. অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ জিনিস এমন আছে যা মানুষের উপকার করে যাচ্ছে। অথচ কোথায় কত সেবক তার সেবা করে যাচ্ছে এবং কি সেবা করছে সে সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।

৯. তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তি পেশ করতে গিয়ে এখানে ইংগিতে নবুওয়াতের পক্ষেও একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এ যুক্তির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ

দুনিয়ায় মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং কার্যত আছেও। এসব পথ তো আর একই সংগে সত্য হতে পারে না। সত্য একটিই এবং যে জীবনাদর্শটি এ সত্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেটিই একমাত্র সত্য জীবনাদর্শ। অন্যদিকে

কর্মেরও অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং এ পথগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটিই একমাত্র সঠিক পথ।

এ সঠিক আদর্শ ও সঠিক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বরং এটিই তার আসল মৌলিক প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য সমস্ত জিনিস তো মানুষের শুধুমাত্র এমন সব প্রয়োজন পূর্ণ করে যা একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রাণী হওয়ার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। কিন্তু এ একটিমাত্র প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষ হবার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। এটি যদি পূর্ণ না হয় তাহলে এর মানে দাঁড়ায় এই যে, মানুষের সমস্ত জীবনটাই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এখন ভেবে দেখো, যে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্বদান করার আগে তোমাদের জন্য এতসব সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যিনি অস্তিত্ব দান করার পর তোমাদের প্রাণী–জীবনের প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূর্ণ করার এমন সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা কি তাঁর কাছে এটা আশা করো যে, তিনি তোমাদের মানবিক জীবনের এই সবচেয়ে বড় ও আসল প্রয়োজনটি পূর্ণ করার ব্যবস্থা না করে থাকবেন?

নবুওয়াতের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাটিই তো করা হয়েছে। যদি তুমি নবুওয়াত না মানো তাহলে বলো তোমার মতে মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? এর জবাবে তুমি একথা বলতে পারো না যে, পথের সন্ধান করার জন্য আল্লাহ্‌ আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে রেখেছেন। কারণ মানবিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ইতিপূর্বেই এমন অসংখ্য পথ উদ্ভাবন করে ফেলেছে যা তার সত্য–সরল পথের সঠিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আবার তুমি একথাও বলতে পারো না যে, আল্লাহ্‌ আমাদের পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা করেননি। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে এরচেয়ে বড় আর কোন কুধারণা হতেই পারে না যে, প্রাণী হবার দিক দিয়ে তোমাদের প্রতিপালন ও বিকাশ লাভের এতসব বিস্তারিত ও পূর্ণাংগ ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন অথচ মানুষ হবার দিক দিয়ে তোমাদের একেবারে অন্ধকারের বুকে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়াবার ও পদে পদে ঠোকর খাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা আর রহমানের ২–৩ টীকা দেখুন)।

১০. অর্থাৎ যদিও আল্লাহ সমস্ত মানুষকে অন্যান্য সকল ক্ষমতাসীন সৃষ্টির মতো জন্মগতভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করে নিজের এ দায়িত্বটি (যা তিনি মানুষকে পথ দেখাবার জন্য নিজেই নিজের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলেন) পালন করতে পারতেন। কিন্তু এটি তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটানো যে নিজের পছন্দ ও বাছ–বিচারের মাধ্যমে সঠিক ও ভ্রান্ত সব রকমের পথে চলার স্বাধীনতা রাখে। এ স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জ্ঞানের উপকরণ, বুদ্ধি ও চিন্তার যোগ্যতা এবং ইচ্ছা ও সংকল্পের শক্তি দান করা হয়েছে। তাকে নিজের ভিতরের ও বাইরের অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।। তার ভিতরে ও বাইরে সবদিকে এমন সব অসংখ্য কার্যকারণ ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা তার জন্য সঠিক পথ পাওয়া ও ভুল পথে পরিচালিত হওয়া উভয়টিরই কারণ হতে পারে। যদি তাকে জন্মগতভাবে

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿١٠﴾ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা পান করে তোমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হও এবং যার সাহায্যে তোমাদের পশুদের জন্যও খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও আরো নানাবিধ ফল জন্মান। এর মধ্যে যারা চিন্তা–ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে একটি বড় নিদর্শন।

তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন এবং সমস্ত তারকাও তাঁরই হুকুমে বশীভূত রয়েছে। যারা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে প্রচুর নিদর্শন। আর এই যে বহু রং বেরংয়ের জিনিস তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করে রেখেছেন এগুলোর মধ্যেও অবশ্যি নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

সঠিক পথানুসারী করে দেয়া হতো তাহলে এসবই অর্থহীন হয়ে যেতো এবং উন্নতির এমন সব উচ্চতম পর্যায়ে পৌছানো মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না, যা কেবলমাত্র স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে পথ দেখাবার জন্য জোরপূর্বক সঠিক পথে পরিচালিত করার পদ্ধতি পরিহার করে রিসালাতের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এভাবে মানুষের স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ন থাকবে, তেমনি তার পরীক্ষার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং সত্য–সরল পথ ও সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে তার সামনে পেশ করে দেয়া যাবে।

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

তিনিই তোমাদের জন্য সাগরকে করায়ত্ব করে রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তরতাজা গোশ্‌ত নিয়ে খাও এবং তা থেকে এমন সব সৌন্দর্য সামগ্রী আহরণ করো যা তোমরা অংগের ভূষণরূপে পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো, সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। এসব এ জন্য, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো[১১] এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।

তিনি পৃথিবীতে পাহাড়সমূহ গেঁড়ে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে।[১২] তিনি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং প্রাকৃতিক পথনির্মাণ করেছেন,[১৩] যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারো। তিনি ভূপৃষ্ঠে পথনির্দেশক চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন[১৪] এবং তারকার সাহায্যেও মানুষ পথনির্দেশ পায়।[১৫]

১১. অর্থাৎ হালাল পথে নিজের রিযিক সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।

১২. এ থেকে জানা যায়, ভূপৃষ্ঠে পর্বত শ্রেণী স্থাপনের উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে পৃথিবীর আবর্তন ও গতি সুষ্ঠু ও সুশৃংখল হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ের এ উপকারিতা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, পাহাড়ের অন্য যে সমস্ত উপকারিতা আছে সেগুলো একেবারেই গৌণ। মূলত মহাশূন্যে আবর্তনের সময় পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া থেকে রক্ষা করাই ভূপৃষ্ঠে পাহাড় স্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৩. অর্থাৎ নদ–নদীর সাথে যে পথ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকাসমূহে এসব প্রাকৃতিক পথের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্যি সমতল ভূমিতেও এগুলোর গুরুত্ব কম নয়।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীটাকে একই ধারায় সৃষ্টি করেননি। বরং প্রত্যেকটি এলাকাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। এর অন্যান্য বিভিন্ন উপকারিতার মধ্যে একটি অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের পথ ও গন্তব্য আলাদাভাবে চিনে নেয়। এ নিয়ামতের মর্যাদা মানুষ তখনই অনুধাবন করতে পারে যখন ঘটনাক্রমে এমন

কোন বালুকাময় মরু প্রান্তরে তাকে যেতে হয় যেখানে এ ধরনের বৈশিষ্টমূলক চিহ্নের প্রায় কোন অস্তিত্বই থাকে না এবং মানুষ প্রতি মুহূর্তে পথ হারিয়ে ফেলার ভয় করতে থাকে। সামুদ্রিক সফরে মানুষ এর চেয়ে আরো বেশী মারাত্মকভাবে এ বিরাট নিয়ামতটি অনুভব করতে থাকে। কারণ সেখানে পথের নিশানী প্রায় একেবারেই থাকে না। কিন্তু মরুভূমি ও সমুদ্রের বুকেও আল্লাহ মানুষের পথ দেখাবার জন্য একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেখানে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তও মানুষ তারকার সাহায্যে পথের সন্ধান করে আসছে।

এখানে আবার তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তির মাঝখানে রিসালাতের যুক্তির দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। এ স্থানটি পড়তে গিয়ে মন আপনা আপনি এই বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যায় যে, যে আল্লাহ তোমাদের বস্তুগত জীবনে পথনির্দেশনার জন্য এতসব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি কি তোমাদের নৈতিক জীবনের ব্যাপারে এতই বেপরোয়া হয়ে যেতে পারেন যে, এখানে তোমাদের পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থাই করবেন না? একথা সুস্পষ্ট, বস্তুগত জীবনে পথভ্রষ্ট হবার সবচেয়ে বড় ক্ষতি নৈতিক জীবনে পথভ্রষ্ট হবার ক্ষতির তুলনায় অতি সামান্যই বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, মহান করুণাময় রব যখন আমাদের বৈষয়িক জীবনকে সহজ ও সফল করার জন্য পাহাড়ের মধ্যে আমাদের জন্য পথ তৈরী করেন, সমতল ক্ষেত্রে পথের চিহ্ন স্থাপন করেন, মরুভূমি ও সাগরের বুকে আমাদের দিকনির্দেশনার জন্য আকাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন তখন তাঁর সম্পর্কে আমরা কেমন করে এ কুধারণা পোষণ করতে পারি যে, তিনি আমাদের নৈতিক সাফল্য ও কল্যাণের জন্য কোন পথই তৈরী করেননি, সেই পথকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য কোন চিহ্নও দাঁড় করাননি এবং তাকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার জন্য কোন উজ্জ্বল প্রদীপও জ্বালাননি?

১৫. এ পর্যন্ত বিশ্বজাহান ও প্রাণী জগতের বহু নিশানী একের পর এক বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ তার নিজের সত্তা থেকে নিয়ে আসমান ও যমীনের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই যেদিকে চায় দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখুক, সেখানে প্রত্যেকটি জিনিসই নবীর বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে এবং কোথাও থেকেও শিরক ও নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে একটি সাক্ষ–প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে তিনি নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে বাকশক্তিসম্পন্ন এবং যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন করে বিতর্ককারী মানুষ তৈরী করেছেন, তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করার জন্য এমন বহু জীব–জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন যাদের চুল, চামড়া, রক্ত, দুধ, গোশ্‌ত ও পিঠের মধ্যে মানবিক প্রকৃতির বহুতর চাহিদা এমনকি তার সৌন্দর্যপ্রিয়তার দাবী পূরণেরও উপাদান রয়ে গেছে। এই যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার এবং ভূপৃষ্ঠে নানা জাতের ফুল, ফল, শস্য ও উদ্ভিদ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, যার অসংখ্য বিভাগ পরস্পরের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে এবং সেগুলো মানুষের প্রয়োজনও পূর্ণ করে। এ রাত ও দিনের নিয়মিত আসা যাওয়া এবং চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির চরম নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল আবর্তন, পৃথিবীর উৎপন্ন ফসল ও মানুষের জীবন–জীবিকার সাথে যার গভীরতম সম্পর্ক বিদ্যমান। এই যে পৃথিবীতে সমুদ্রের অস্তিত্ব এবং তার মধ্যে মানুষের বহু প্রাকৃতিক ও সৌন্দর্য প্রীতির চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই যে পানির কতিপয় বিশেষ আইনের শৃংখলে বাঁধা থাকা এবং তারপর

أَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ ۙ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

তাহলে ভেবে দেখতো যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান?[১৬] *তোমরা কি সজাগ হবে না? যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও তাহলে গুণতে পারবে না। আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*[১৭] *অথচ তিনি তোমাদের প্রকাশ্যও জানেন এবং গোপনও জানেন।*[১৮]

আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব সত্তাকে লোকেরা ডাকে তারা কোন একটি জিনিসেরও স্রষ্টা নয় বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি। তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তারা কিছুই জানেনা তাদেরকে কবে (পুনর্বার জীবিত করে) উঠানো হবে।[১৯]

তার এ উপকারিতা যে মানুষ সমুদ্রের মতো ভয়াবহ বস্তুর বুক চিরে-তার মধ্যে নিজের জাহাজ চালায় এবং দেশ থেকে দেশান্তরে সফর ও বাণিজ্য করে। এই যে পৃথিবীর বুকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি এবং মানুষের অস্তিত্বের জন্য তাদের অপরিহার্যতা। এই যে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে অসীম মহাশূন্যের বুক পর্যন্ত অসংখ্য চিহ্ন ও বিশেষ নিশানীর বিস্তার এবং তারপর এসব মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা। এসব জিনিসই পরিষ্কার সাক্ষ দিচ্ছে যে, একটি সত্তাই এ পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। তিনি একাই নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী এসবের ডিজাইন তৈরী করেছেন। তিনিই এ ডিজাইন অনুযায়ী তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রতি মুহূর্তে এ দুনিয়ায় নিত্য নতুন জিনিস তৈরী করে করে এমনভাবে সামনে আনছেন যার ফলে সমগ্র পরিকল্পনা ও তার নিয়ম-শৃংখলায় সামান্যতম ফারাকও আসছে না। আর তিনি একাই পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত এ সুবিশাল কারখানাটি চালাচ্ছেন। একজন নির্বোধ বা হঠকারী ছাড়া আর কে-ইবা একথা বলতে পারে যে, এসব কিছুই একটি আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়? অথবা এ চরম সুশৃংখল, সুসংবদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বজাহানের বিভিন্ন কাজ বা বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন খোদার সৃষ্ট এবং বিভিন্ন খোদার পরিচালনাধীন?

১৬. অর্থাৎ যদি তোমরা একথা মানো (যেমন বাস্তবে মক্কার কাফেররাও এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশ্‌রিকরাও মানতো) যে, একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা এবং এ বিশ্বজগতে তোমাদের উপস্থাপিত শরীকদের একজনও কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি করা ব্যবস্থায় অস্রষ্টাদের মর্যাদা কেমন করে স্রষ্টার সমান অথবা কোনভাবেই তাঁর মতো

হতে পারে? নিজের সৃষ্ট জগতে স্রষ্টা যেসব ক্ষমতা-ইখ্তিয়ারের অধিকারী অ-স্রষ্টারাও তার অধিকারী হবে এবং স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিলোকের ওপর যেসব অধিকার রাখেন অ-স্রষ্টারাও তাই রাখবে, এটা কেমন করে সম্ভব? স্রষ্টা ও অ-স্রষ্টার গুণাবলী একই রকম হবে অথবা তারা একই প্রজাতিভুক্ত হবে, এমনকি তাদের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হবে, এটা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে?

১৭. প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে একটি বিরাট অকথিত কাহিনী রয়ে গেছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, সেটি এতই সুস্পষ্ট যে, এখানে তার জের টানার কোন প্রয়োজন নেই। তার প্রতি এ সামান্যমাত্র ইংগিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পরপরই তাঁর ক্ষমাশীল ও করুণাময় হবার কথা উল্লেখ করতে হবে। এ থেকে জানা যায়, যে মানুষের সমগ্র সত্তা ও সারাটা জীবন আল্লাহর অনুগ্রহের সূতোয় বাঁধা সে কেমন সব অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের মাধ্যমে নিজের উপকারীর উপকার ও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের জবাব দিয়ে যাচ্ছে? অন্যদিকে তার এ উপকারী ও অনুগ্রহদাতা এমন ধরনের করুণাশীল ও সহিষ্ণু যে, এমন সব কার্যকলাপের পরও তিনি বছরের পর বছর একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এবং শত শত বছর একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান জাতিকে নিজের অনুগ্রহদানে আপ্লুত করে চলেছেন। এখানে দেখা যাবে, এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং তারপরও তার প্রতি প্রবল ধারায় অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে আবার এক ব্যক্তি স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার সব কিছুতেই অ-স্রষ্টা সত্তাদেরকে শরীক করে চলছে এবং দানের জন্য দানকারীর পরিবর্তে অ-দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এরপরও এখানে দেখা যাবে দাতা-হস্ত দান করতে বিরত হচ্ছে না। এখানে এ দৃশ্যও দেখা যাবে যে, এক ব্যক্তি স্রষ্টাকে স্রষ্টা ও অনুগ্রহদাতা হিসেবে মেনে নেয়ার পরও তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহ ও নাফরমানী করা নিজের অভ্যাসে পরিণত এবং তাঁর আনুগত্যের শৃংখল গলায় থেকে নামিয়ে দেয়াকে নিজের নীতি ও বিধি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এরপরও সারাজীবন স্রষ্টার অপরিসীম অনুগ্রহের ধারায় সে আপ্লুত হয়ে চলেছে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকার এবং শিরক ও গোনাহের কাজ করা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহের সিলসিলা বন্ধ না হওয়ার কারণ আল্লাহ লোকদের কার্যকলাপের কোন খবর রাখেন না,—কোন নির্বোধ যেন একথা মনে না করে বসে। এটা অজ্ঞতার কারণে আন্দাজে ভাগ বাঁটোয়ারা করার বা ভুলে কাউকে দান করে দেবার ব্যাপার নয়। এটা তো সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার ব্যাপার। অপরাধীদের গোপন ভেদ বরং তাদের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা সংকল্পগুলোর বিস্তারিত চেহারা জানার পরও এ ধরনের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এটা এমন পর্যায়ের সৌজন্য, দানশীলতা ও ঔদার্য যে একমাত্র রব্বুল আলামীনের পক্ষেই এটা শোভা পায়।

১৯. এ শব্দগুলো পরিষ্কার একথা ঘোষণা করছে যে, এখানে বিশেষভাবে যেসব বানোয়াট মাবুদদের প্রতিবাদ করা হচ্ছে তারা ফেরেশতা, জিন, শয়তান বা কাঠ-পাথরের মূর্তি নয় বরং তারা হচ্ছে কবরবাসী। কারণ ফেরেশতা ও শয়তানরা তো জীবিত আছে, তাদের প্রতি أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ (জীবিত নয় মৃত) শব্দাবলী প্রযোজ্য হতে পারে না। আর

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

৩ রুকূ'

এক ইলাহই তোমাদের আল্লাহ। কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তাদের অন্তরে অস্বীকৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে ডুবে গেছে।[২০] নিসন্দেহে আল্লাহ তাদের সমস্ত কার্যকলাপ জানেন, যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। তিনি তাদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না যারা আত্মগরিমায় ডুবে থাকে।

আর[২১] যখন কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের রব এ কী জিনিস নাযিল করেছেন? তারা বলে, "জ্বী, ওগুলো তো আগের কালের বস্তাপচা গপ্পো।"[২২] এসব কথা তারা এজন্য বলছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝা পুরোপুরি উঠাবে আবার সাথে সাথে তাদের বোঝাও কিছু উঠাবে যাদেরকে তারা অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট করছে। দেখো, কেমন কঠিন দায়িত্ব, যা তারা নিজেদের মাথায় নিয়ে নিচ্ছে।

কাঠ–পাথরের মূর্তির ক্ষেত্রে তো মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (তারা জানে না তাদের কবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে) ধরনের শব্দাবলীর ব্যবহার তাদেরকেও আলোচনার বাইরে রেখে দেয়। এখন এ আয়াতে الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ (আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব সত্তাকে লোকেরা ডাকে) এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে নবী, আউলিয়া, শহীদ, সৎ ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য অসাধারণ লোকদের কথাই বলা হয়েছে। অতি ভক্তের দল এসব সত্তাকে সংকট নিরসনকারী, অভিযোগের প্রতিকারকারী, দরিদ্রের সহায়, ধনদাতা এবং নাজানি আরো কত কিছু মনে করে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ডাকতে থাকে। এর জবাবে যদি কেউ বলেন, আরবে এ ধরনের মাবুদ বা দেব–দেবী পাওয়া যেতো না তাহলে আমি বলবো এটা তার আরবীয় জাহেলিয়াতের ইতিহাস না জানার প্রমাণ। লেখাপড়া জানা লোকদের কে–ইবা একথা জানে না যে, বারী'আহ, কাল্ব, তাগ্লাব, কুদা'আহ, কিনানাহ, হার্স, কা'ব, কিন্দাহ ইত্যাদি বহু আরব গোত্রে বিপুল সংখ্যক খৃষ্টান ও ইহুদী ছিল। আর এ দু'টি

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ'

তাদের আগেও বহু লোক (সত্যকে খাটো করে দেখাবার জন্য) এমনি ধরনের চক্রান্ত করেছিল। তবে দেখে নাও, আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারত সমূলে উৎপাটিত করেছেন এবং তার ছাদ ওপর থেকে তাদের মাথার ওপর ধ্বসে পড়ছে এবং এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসেছে যেদিক থেকে তার আসার কোন ধারণাই তাদের ছিল না। তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে বলবেন, "বলো, এখন কোথায় গেলো আমার সেই শরীকরা যাদের জন্য তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) ঝগড়া করতে?"—যারা[২৩] দুনিয়ায় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল তারা বলবে, "আজ কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য।"

ধর্মের লোকেরা ব্যাপকভাবে নবী, আউলিয়া ও শহীদদের পূজা করতো। তাছাড়া মৃত লোকরাই ছিল আরব মুশরিকদের অধিকাংশের না হলেও বহু লোকের উপাস্য। পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী মৃত লোকদেরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ ওয়াদ্দা, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক, নাস্‌র—এগুলো ছিল পূর্বকালের সৎলোকদের নাম। পরবর্তীকালের লোকেরা তাদের দেব মূর্তি নির্মাণ করে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইসাফ ও নায়েলাহ উভয়ই মানুষ ছিল। এ ধরনের বর্ণনা লাত, মানাত ও উয্‌যা সম্পর্কেও পাওয়া যায়। হাদীসে মুশরিকদের এ আকীদাও বর্ণিত হয়েছে যে, লাত ও উয্‌যা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ফলে তিনি শীতকালটি লাতের কাছে এবং গ্রীষ্মকালটি উয্‌যার কাছে কাটাতেন। سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ (আল্লাহর প্রতি তারা যে দোষারোপ করে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র)।

২০. অর্থাৎ আখেরাত অস্বীকৃতি তাদেরকে এতই দায়িত্বহীন, বেপরোয়া ও পার্থিব জীবনের ভোগ–বিলাসে মত্ত করে দিয়েছে যে এখন যে কোন সত্য অস্বীকার করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। তাদের কাছে কোন সত্যের কদর নেই। তারা নিজেরা কোন নৈতিক বাঁধন

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۸﴾ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۲۹﴾

হ্যাঁ,[২৪] এমন কাফেরদের জন্য, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায় যখন ফেরেশতাদের হাতে পাকড়াও হয়[২৫] তখন সংগে সংগেই (অবাধ্যতা ত্যাগ করে) আত্মসমর্পণ করে এবং বলে, "আমরা তো কোন দোষ করছিলাম না।" ফেরেশতারা জবাব দেয়, "কেমন করে দোষ করছিলে না! তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। এখন যাও, জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো, ওখানেই তোমাদের থাকতে হবে চিরকাল।"[২৬] সত্য বলতে কি, অহংকারীদের এই ঠিকানা বড়ই নিকৃষ্ট।

মেনে চলতে প্রস্তুত নয়। তারা যে পথে চলছে সেটি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কিনা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখা ও বিচার–বিশ্লেষণ করার কোন পরোয়াই তাদের নেই।

২১. এখান থেকে ভাষণের মোড় অন্যদিকে ফিরে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব শয়তানী কাজ–কারবার চালানো হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হচ্ছিল, ঈমান না আনার জন্য যেসব বাহানাবাজী করা হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি আনা হচ্ছিল, —সবগুলোকে এক একটি করে পর্যালোচনা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে উপদেশ দান, ভয় দেখানো ও নসিহত করা হয়েছে।

২২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের চর্চা যখন চারদিকে হতে লাগলো তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেতো সেখানেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের ওখানে যে ব্যক্তি নবী হয়ে এসেছেন তিনি কি শিক্ষা দেন? কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব তার মধ্যে কি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মক্কার কাফেররা সবসময় এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতো যাতে প্রশ্নকারীর মনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে কিতাবটি এনেছেন সে সম্পর্কে কোন না কোন সন্দেহ জাগতো অথবা কমপক্ষে তার মনে নবীর বা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সকল প্রকার আগ্রহ খতম হয়ে যেতো।

২৩. আগের বাক্যটি এবং এ বাক্যটির মাঝখানে একটি সূক্ষ্মতর ফাঁক রয়ে গেছে। শ্রোতা নিজেই সামান্য চিন্তা–ভাবনা করে এ ফাঁকটুকু পূর্ণ করতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, মহান আল্লাহ যখন এ প্রশ্ন করবেন তখন হাশরের ময়দানে চারদিকে গভীর নীরবতা বিরাজ করবে। কাফের ও মুশরিকদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব থাকবে না। তাই তারা নির্বাক হয়ে যাবে এবং তত্ত্ব–জ্ঞানীরা পরস্পর এসব কথা বলাবলি করতে থাকবে।

২৪. তত্ব–জ্ঞানীদের উক্তির সাথে একথাটি বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ নিজেই ব্যাখ্যামূলকভাবে বলছেন। যারা এটাকেও তত্ব–জ্ঞানীদের উক্তি মনে করেছেন তাদের এক্ষেত্রে বড়ই জটিল ব্যাখ্যা তৈরী করতে হয়েছে এবং তারপরও তাদের কথা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারেনি।

২৫. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলো তাদের দেহ পিঞ্জর থেকে বের করে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেয়।

২৬. এ আয়াত এবং এর পরবর্তী যে আয়াতে মৃত্যুর পর মুত্তাকী ও ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কুরআন মজীদের এমন ধরনের আয়াতের অন্যতম যেগুলো সুস্পষ্টভাবে কবরের আযাব ও সওয়াবের প্রমাণ পেশ করে। হাদীসে "আলমে বরযখ"–এর জন্য কবর শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে এর অর্থ হয় এমন একটি জগত যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৃত্যু লাভ করার পর থেকে নিয়ে পরবর্তী পুনরুত্থান লাভ করার প্রাক্কালে প্রথম ধাক্কা খাওয়া পর্যন্ত মানবিক রূহগুলো অবস্থান করবে। হাদীস অস্বীকারকারীদের জোর বক্তব্য হচ্ছে, এ জগতটি একটি নিরেট শূন্যতার জগত ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে কারো কোন্ অনুভূতি ও চেতনা থাকবে না এবং কোন আযাব বা সওয়াবও কারো হবে না। কিন্তু এখানে দেখুন, কাফেরদের মৃত্যু হবার পর তাদের রূহগুলো মৃত্যু পারের জগতে গিয়ে সেখানকার অবস্থা নিজেদের প্রত্যাশার বিপরীত পেয়ে হতবাক হয়ে যায় এবং সংগে সংগেই ফেরেশতাদেরকে অভিবাদন করে এ মর্মে নিশ্চয়তা দান করার চেষ্টা করতে থাকে যে, তারা কোন খারাপ কাজ করছিল না। জবাবে ফেরেশতারা তাদেরকে ধমক দেন এবং তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার আগাম খবর দিয়ে দেন। অন্যদিকে মুত্তাকীদের মৃত্যুর পর ফেরেশতারা তাদের রূহকে সালাম করেন এবং তাদেরকে জান্নাতী হবার জন্য আগাম মোবারকবাদ দেন। বরযখের জীবন, অনুভূতি, চেতনা, আযাব ও সওয়াবের জন্য কি এরচেয়ে বেশী প্রমাণের প্রয়োজন আছে? সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াতে প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তুর আলোচনা এসেছে। সেখানে যেসব মুসলমান হিজরত করেনি তাদের মৃত্যুর পর তাদের রূহের সাথে ফেরেশতাদের কথাবার্তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবার সূরা মু'মিনের ৪৫–৪৬ আয়াতে এসবের চাইতে বেশী সুস্পষ্ট ভাষায় বরযখের আযাবের কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ ফেরাউন ও ফেরাউনের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বলেছেন, "একটি কঠিন আযাব তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। অর্থাৎ সকাল–সাঁঝে তাদেরকে আগুনের সামনে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন কিয়ামতের সময় এসে যাবে তখন হুকুম দেয়া হবে—ফেরাউনের পরিবারবর্গকে কঠিনতম আযাবের মধ্যে ঠেলে দাও।"

মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের অবস্থাটি সম্পর্কে আসলে কুরআন ও হাদীস উভয় থেকে একই চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রটি হচ্ছে ঃ মৃত্যু নিছক দেহ ও রূহের আলাদা হয়ে যাবার নাম,—সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নাম নয়। দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর রূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না বরং দুনিয়াবী জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ও নৈতিক উপার্জনের মাধ্যমে যে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার সবটুকু সহকারে জীবিত থাকে। এ অবস্থায় রূহের চেতনা অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অবস্থা অনেকটা স্বপ্নের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি অপরাধী রূহকে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর তার আযাব ও

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوْا خَيْرًا ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ۚ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

অন্যদিকে যখন মুত্তাকীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কী নাযিল হয়েছে, তারা জবাব দেয়, "সর্বোত্তম জিনিস নাযিল হয়েছে।"[২৭] এ ধরনের সৎকর্মশীলদের জন্য এ দুনিয়াতেও মংগল রয়েছে এবং আখেরাতের আবাস তো তাদের জন্য অবশ্যি উত্তম। বড়ই ভালো আবাস মুত্তাকীদের, চিরন্তন অবস্থানের জান্নাত, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী এবং সব কিছুই সেখানে তাদের কামনা অনুযায়ী থাকবে।[২৮] এ পুরস্কার দেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে।

যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে যাওয়া এবং তাকে দোযখের সামনে উপস্থাপিত করা —এসব কিছু এমন একটি অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে যা একজন খুনের আসামীকে ফাঁসী দেবার তারিখের একদিন আগে একটি ভয়ংকর স্বপ্নের আকারে তার কাছে উপস্থিত হয়। অনুরূপভাবে একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ রূহের সম্বর্ধনা, তারপর তার জান্নাতের সুখবর শোনা এবং জান্নাতের বাতাস ও খোশবুতে আপ্লুত হওয়া—এসব কিছুও এমন একজন কর্মচারীর স্বপ্নের সাথে মিলে যায় যে সুচারুরূপে নিজের কাজ সম্পন্ন করার পর সরকারের ডাকে হেড কোয়ার্টারে হাযির হয় এবং সাক্ষাতকারের জন্য চুক্তিবদ্ধ তারিখের একদিন আগে ভবিষ্যত পুরস্কারের প্রত্যাশাদীপ্ত একটি মধুর স্বপ্ন দেখে। শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকারে এ স্বপ্ন হঠাৎ ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। এবং অকস্মাত নিজেদেরকে দেহ ও রূহ সহকারে হাশরের ময়দানে জীবিত অবস্থায় পেয়ে অপরাধীরা অবাক হয়ে বলবে, يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا (আরে, আমাদের শয়নগৃহ থেকে আমাদের উঠিয়ে আনলো কে?)। কিন্তু ঈমানদাররা পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে বলবে, هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ (করুণাময় আল্লাহ এ জিনিসেরই ওয়াদা করেছিলেন এবং রসূলদের বর্ণনা সঠিক ছিল)। অপরাধীদের তাৎক্ষণিক অনুভূতি তখন এ হবে যে, তারা নিজেদের শয়নগৃহে (দুনিয়ায় মৃত্যুর বিছানায় যেখানে তারা প্রাণ ত্যাগ করেছিল) সম্ভবত ঘন্টাখানেকের মতো সময় শয়ন করে থাকবে এবং হঠাৎ এ দুর্ঘটনায় চোখ খোলার সাথে সাথেই কোথাও দৌড়ে চলছে। অন্যদিকে ঈমানদাররা পূর্ণ মানসিক ধৈর্য সহকারে বলবে :

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

الَّذِينَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

এমন মুত্তাকীদেরকে, যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যখন মৃত্যু ঘটায় তখন বলে, "তোমাদের প্রতি শান্তি, যাও নিজেদের কর্মকাণ্ডের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করো।"

হে মুহাম্মাদ! এখন যে এরা অপেক্ষা করছে, এ ক্ষেত্রে এখন ফেরেশ্তাদের এসে যাওয়া অথবা তোমার রবের ফায়সালা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আর কী বাকি রয়ে গেছে?[২৯] এ ধরনের হঠকারিতা এদের আগে আরো অনেক লোক করেছে। তারপর তাদের সাথে যা কিছু হয়েছে তা তাদের ওপর আল্লাহর জুলুম ছিল না বরং তাদের নিজেদেরই জুলুম ছিল যা তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছিল। তাদের কৃতকর্মের অনিষ্টকারিতা শেষপর্যন্ত তাদের ওপরই আপতিত হয়েছে এবং যেসব জিনিসকে তারা ঠাট্টা করতো সেগুলোই তাদের ওপর চেপে বসেছে।

"আল্লাহর দফতরে তোমরা তো হাশরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে থেকেছো, আর এ সেই হাশরের দিন কিন্তু তোমরা এ জিনিসটি জানতে না।"

২৭. অর্থাৎ মক্কার বাইরের লোকেরা যখন আল্লাহর ভয়ে ভীত সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে শিক্ষা এনেছেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তাদের জবাব মিথ্যুক ও অবিশ্বাসী কাফেরদের জবাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। তারা মিথ্যা প্রচারণা চালায় না। তারা জনগণকে ধোঁকা দেবার ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে না। তারা নবীর এবং তিনি যে শিক্ষা এনেছেন তার প্রশংসা করে এবং সঠিক পরিস্থিতি লোকদেরকে জানায়।

২৮. এ হচ্ছে জান্নাতের আসল সংজ্ঞা। সেখানে মানুষ যা চাইবে তা পাবে। তার ইচ্ছা ও পছন্দ বিরোধী কোন কাজই সেখানে হবে না। দুনিয়ায় কোন প্রধান ব্যক্তি, কোন প্রধান নেতা এবং কোন বিশাল রাজ্যের অধিকারী বাদশাহও কোন দিন এ নিয়ামত লাভ করেনি। দুনিয়ায় এ ধরনের নিয়ামত লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ
نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ
بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ
فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৫ রুকূ'

এ মুশরিকরা বলে, "আল্লাহ চাইলে তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত আমরাও করতামনা, আমাদের বাপ–দাদারাও করতো না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতো না।"[৩০] এদের আগের লোকেরাও এমনি ধরনের বাহানাবাজীই চালিয়ে গেছে।[৩১] তাহলে কি রসূলদের ওপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব আছে? প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী পরিহার করো।"[৩২] এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কারোর ওপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে।[৩৩] তারপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।[৩৪]

জান্নাতের প্রত্যেক অধিবাসীই সেখানে আনন্দ ও উপভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তার জীবনে সর্বক্ষণ সবদিকে সবকিছু হবে তার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী। তার প্রত্যেকটি আশা সফল হবে, প্রত্যেকটি কামনা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও আকাংখা বাস্তবায়িত হবে।

২৯. উপদেশ ও সতর্কবাণী হিসেবে একথা কয়টি বলা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, যতদূর বুঝাবার ব্যাপার ছিল তুমি তো প্রত্যেকটি সত্যকে উন্মুক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছো। যুক্তির সাহায্যে তার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছো। বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থা থেকে এর পক্ষে সাক্ষ উপস্থাপন করেছো। কোন বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শিরকের ওপর অবিচল থাকার কোন অবকাশই রাখোনি। এখন এরাই একটি সরল সোজা কথা মেনে নেবার

ব্যাপারে ইতস্তত করছে কেন? এরা কি মউতের ফেরেশতার অপেক্ষায় আছে? এ ফেরেশতা সামনে এসে গেলে তখন জীবনের শেষ মুহূর্তে কি এরা তা মেনে নেবে? অথবা আল্লাহর আযাব সামনে এসে গেলে তার প্রথম আঘাতের পর তা মেনে নেবে?

৩০. সূরা আন'আমের ১৪৮—১৪৯ আয়াতেও মুশরিকদের এ যুক্তি উত্থাপন করে এর জবাব দেয়া হয়েছে। সেই আয়াতগুলো এবং সেখানে বর্ণিত টীকা সামনে থাকলে এ বিষয়টি অনুধাবন করা বেশী সহজ হবে। (দেখুন সূরা আন'আম ১২৪—১২৬ টীকা)।

৩১. অর্থাৎ এটা কোন নতুন কথা নয়। আজ তোমরা আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের কারণ হিসেবে পেশ করছো। এটা অতি পুরাতন যুক্তি। বিভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের বিবেককে ধোঁকা দেবার এবং উপদেশদাতাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এ যুক্তি আউড়ে আসছে। এটা হচ্ছে মুশরিকদের যুক্তির প্রথম জবাব। এ জবাবটির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে একথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, মাত্র এখনই কয়েক লাইন আগেই "জ্বী ওগুলো তো পুরাতন যুগের বস্তাপচা কাহিনী" বলে কুরআনের বিরুদ্ধে মুশরিকদের প্রচারণার উল্লেখ এসে গেছে। অর্থাৎ নবীর বিরুদ্ধে তাদের যেন এ আপত্তি ছিল যে, ইনি আবার নতুন কথাই বা কি বলছেন, সেই পুরানো কথাই তো বলে চলছেন। নূহের প্লাবনের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হাজার বার একথা বলা হয়েছে। এর জবাবে তাদের যুক্তি (যাকে তারা বড়ই শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে পেশ করতো) উদ্ধৃত করার পর এ সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, মহোদয়গণ। আপনারাই বা কোন্ অত্যাধুনিক? আপনারা এই যে চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছেন এতেও আদতেই কোন অভিনবত্ব নেই। এটিও বহুকালের বাসি–বস্তাপচা খোঁড়া যুক্তি। হাজার বছর থেকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টরা এ একই গীত গেয়ে আসছে। আপনারাও সেই পচা গীতটিই গেয়ে উঠেছেন।

৩২. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের শিরক এবং নিজেদের তৈরী হালাল–হারামের বিধানের পক্ষে আমার ইচ্ছাকে কেমন করে বৈধতার ছাড়পত্র দানকারী হিসেবে পেশ করতে পারো? আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে নিজের রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের মাধ্যমে লোকদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আমার বন্দেগী করা। তাগুতের বন্দেগী করার জন্য তোমাদের পয়দা করা হয়নি। এভাবে আমি যখন পূর্বাহ্নেই ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমাদের এসব বিভ্রান্ত কাজ কারবারের পক্ষে আমার সমর্থন নেই তখন এরপর আমার ইচ্ছাকে ঢাল বানিয়ে তোমাদের নিজেদের ভ্রষ্টতাকে বৈধ গণ্য করা পরিষ্কারভাবে একথাই ব্যক্ত করছে যে, তোমরা চাচ্ছিলে আমি উপদেশদাতা রসূল পাঠাবার পরিবর্তে এমন রসূল পাঠাতাম যিনি তোমাদের হাত ধরে ভুল পথ থেকে টেনে সরিয়ে নিতেন এবং জোর করে তোমাদেরকে সত্য সঠিক পথে পরিচালিত করতেন। (আল্লাহর অনুমতিদান ও পছন্দ করার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য সূরা আন'আমের ৮০ এবং সূরা যুমারের ২০ টীকা দেখুন)।

৩৩. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর আগমনের পর তাঁর জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একদল তাঁর কথা মেনে নিয়েছে (আল্লাহ তাদেরকে এ মেনে নেয়ার তাওফীক দিয়েছিলেন) এবং অন্য দলটি নিজেদের গোমরাহীর ওপর অবিচল থেকেছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন'আম ২৮ টীকা)।

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

হে মুহাম্মাদ! তুমি এদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য যতই আগ্রহী হও না কেন, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে আর সঠিক পথে পরিচালিত করেন না আর এ ধরনের লোকদের সাহায্য কেউ করতে পারে না।

এরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, "আল্লাহ কোন মৃতকে পুনর্বার জীবিত করে উঠাবেন না।"—কেন উঠাবেন না? এতো একটি ওয়াদা, যেটি পুরা করা তিনি নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না, আর এটি হওয়া এ জন্য প্রয়োজন যে, এরা যে সত্যটি সম্পর্কে মতবিরোধ করছে আল্লাহ সেটি এদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন এবং সত্য অস্বীকারকারীরা জানতে পারবে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।[৩৫] (এর সম্ভাবনার ব্যাপারে বলা যায়) কোন জিনিসকে অস্তিত্বশীল করার জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দিই "হয়ে যাও" এবং তা *হয়ে যায়।*

৩৪. অর্থাৎ নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার চাইতে আর কোন বড় নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নেই। এখন তুমি নিজেই দেখে নাও, মানব ইতিহাসের একের পর এক অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করছে? আল্লাহর আযাব কার ওপর এসেছে– ফেরাউন ও তার দলবলের ওপর, না মূসা ও বনী ইসরাঈলের ওপর? সালেহকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের ওপর, না তাঁকে যারা মেনে নিয়েছিল তাদের ওপর? হূদ, নূহ ও অন্যান্য নবীদেরকে যারা অমান্য করেছিল তাদের ওপর, না মু'মিনদের ওপর? এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলোর ফল কি এই দাঁড়িয়েছে যে, আমার ইচ্ছার কারণে যারা শিরক করার ও শরীয়াত গঠনের সুযোগ লাভ করেছিল তাদের প্রতি আমার সমর্থন ছিল? বরং বিপরীত পক্ষে এ ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করছে যে, উপদেশ ও অনুশাসন সত্বেও যারা এসব গোমরাহীর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়ে চলেছে। আমার ইচ্ছাশক্তি

তাদেরকে অপরাধ করার অনেকটা সুযোগ দিয়েছে। তারপর তাদের নৌকা পাপে ভরে যাবার পর ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩৫. এ বক্তব্য থেকে মৃত্যুর পরের জীবন এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অপরিহার্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। দুনিয়ায় যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সত্য সম্পর্কে অসংখ্য মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এসব মতবিরোধের ভিত্তিতে বংশ, গোত্র, জাতি ও পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোরই ভিত্তিতে বিভিন্ন মতাদর্শের ধারকরা নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা তৈরী অথবা গ্রহণ করে নিয়েছে। এক একটি মতাদর্শের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্বে হাজার হাজার লাখো লাখো লোক বিভিন্ন সময় ধন, প্রাণ, ইজ্জত–আবরু সব কিছু কুরবানী করে দিয়েছে। আর এ মতাদর্শের সমর্থকদের মধ্যে বহু সময় এমন মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে যে, তারা একদল অন্যদলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করেছে এবং যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল তারা এ অবস্থায়ও নিজেদের দৃষ্টিভংগী পরিহার করেনি। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর মননশীল মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিবেকের দাবী এই যে, এক সময় না এক সময় সঠিক ও নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হোক যথার্থই তাদের মধ্যে হক কি ছিল এবং বাতিল কি ছিল, কে সত্যপন্থী ছিল এবং কে মিথ্যাপন্থী। এ দুনিয়ায় এ যবনিকা সরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই এমন যে, এখানে সত্য কোনদিন পরদার বাইরে আসতে পারে না। কাজেই বিবেকের এ দাবী পূরণ করার জন্য ভিন্ন আরেকটি জগতের প্রয়োজন।

আর এটি শুধুমাত্র বিবেক–বুদ্ধির দাবীই নয় বরং নৈতিকতারও দাবী। কেননা, এসব মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব–সংঘাতে বহুদল অংশ নিয়েছে। কেউ জুলুম করেছে এবং কেউ জুলুম সহ্য করেছে। কেউ কুরবানী দিয়েছে এবং কেউ সেই কুরবানী আদায় করে নিয়েছে। প্রত্যেকে নিজের মতাদর্শ অনুযায়ী একটি নৈতিক দর্শন ও একটি নৈতিক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছে এবং তা থেকে কোটি কোটি মানুষের জীবন ভালো বা মন্দ প্রভাব গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি সময় অবশ্যি হওয়া উচিত যখন এদের সবার নৈতিক ফলাফল ভালো বা মন্দের আকারে প্রকাশিত হবে। এ দুনিয়ার ব্যবস্থা যদি সঠিক ও পূর্ণাংগ নৈতিক ফলাফলের প্রকাশকে ধারণ করতে অপারগ হয় তাহলে অবশ্যি অন্য একটি দুনিয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত যেখানে এ ফলাফলের প্রকাশ সম্ভব হতে পারে।

৩৬. অর্থাৎ লোকেরা মনে করে, মরার পর মানুষকে পুনরবার সৃষ্টি করা এবং সামনের পেছনের সমগ্র মানব–কূলকে একই সংগে পুনরুজ্জীবিত করা বড়ই কঠিন কাজ। অথচ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। নিজের কোন সংকল্প পূর্ণ করার জন্য তাঁর কোন সাজ–সরঞ্জাম, উপায়–উপকরণ ও পরিবেশের আনুকূল্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশেই পূর্ণ হয়। তাঁর নির্দেশই সাজ–সরঞ্জামের জন্ম দেয়। তাঁর নির্দেশেই উপায়–উপকরণের উদ্ভব হয়। তাঁর নির্দেশই তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবেশ তৈরী করে। বর্তমানে যে দুনিয়ার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, এটিও নিছক হুকুম থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং অন্য দুনিয়াটিও মুহূর্তকালের মধ্যে শুধুমাত্র একটি হুকুমেই জন্ম লাভ করতে পারে।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىۡ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৬ রুকূ'

যারা জুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমি দুনিয়াতেই ভালো আবাস দেবো এবং আখেরাতের পুরস্কার তো অনেক বড়।[৩৭] হায়! যে মজলুমরা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে কাজ করছে তারা যদি জানতো (কেমন চমৎকার পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে)।

হে মুহাম্মাদ! তোমার আগে আমি যখনই রসূল পাঠিয়েছি, মানুষই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি নিজের অহী প্রেরণ করতাম।[৩৮] যদি তোমরা নিজেরা না জেনে থাকো তাহলে বাণীওয়ালাদেরকে জিজ্ঞেস করো।[৩৯]

৩৭. যেসব মুহাজির কাফেরদের অসহনীয় জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে হাবশায় (ইথিয়োপিয়া) হিজরত করেছিলেন এখানে তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আখেরাত অস্বীকারকারীদের কথার জবাব দেবার পর অকস্মাত হাবশার মুহাজিরদের প্রসংগ উত্থাপন করার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় নিহিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মক্কার কাফেরদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা যে, ওহে জালেমের দল! এ ধরনের জুলুম নির্যাতন চালাবার পর এখন তোমরা মনে করছো তোমাদেরকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং মজলুমদের প্রতিশোধ নেবার সময় কখনো আসবে না।

৩৮. এখানে মক্কার মুশরিকদের একটি আপত্তি উদ্ধৃত না করেই তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ আপত্তিটি ইতিপূর্বে সকল নবীর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীনরাও তাঁর কাছে বারবার এ আপত্তি জানিয়েছিল। এ আপত্তিটি ছিল এই যে, আপনি আমাদের মতই একজন মানুষ, তাহলে আল্লাহ আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন আমরা একথা কেমন করে মেনে নেবো?

৩৯. "বাণী ওয়ালা" অর্থাৎ আহলি কিতাবদের আলেম সমাজ এবং আরো এমন সব লোক যারা নাম-করা আলেম না হলেও মোটামুটি আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন বৃত্তান্ত জানেন।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾ اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾

আগের রসূলদেরকেও আমি উজ্জ্বল নিদর্শন ও কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং এখন এ বাণী তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করে যেতে থাকো। যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে [৪০] এবং যাতে লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা–ভাবনা করে।

তারপর যারা (নবীর দাওয়াতের বিরোধিতায়) নিকৃষ্টতম চক্রান্ত করছে তারা কি এ ব্যাপারে একেবারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দেবেন না অথবা এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব আসবে না যেদিক থেকে তার আসার ধারণা–কল্পনাও তারা করেনি?

৪০. ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ শুধু মুখে নয় বরং নিজের কাজের মাধ্যমেও এবং নিজের নেতৃত্বে একটি মুসলিম সমাজ গঠন করেও আর এই সংগে 'আল্লাহর যিকির' তথা কিতাবের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ সমাজ পরিচালনা করেও।

এভাবে একজন মানুষকেই নবী বানিয়ে পাঠানোর পেছনে যে নিগূঢ় যৌক্তিকতা নিহিত ছিল মহান আল্লাহ সে যৌক্তিকতাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। 'যিকির' বা আল্লাহর বাণী ফেরেশতাদের মাধ্যমেও পাঠানো যেতো। সরাসরি ছাপিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের হাতেও পৌছানো যেতে পারতো। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ স্বীয় সুগভীর প্রজ্ঞা, করুণা ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের আলোকে এ যিকির বা অহী অবতারণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র ছাপানো একখানা গ্রন্থ বা পুস্তিকা পাঠিয়ে দিলেই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারতো না। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য যা অপরিহার্য ছিল তা হলো একজন যোগ্যতম মানুষ তা সাথে করে নিয়ে আসবেন, তিনি তাকে একটু একটু করে লোকদের সামনে পেশ করবেন। যারা এর কোন কথা বুঝতে পারবে না তাদেরকে তার অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। যাদের এর কোন ব্যাপারে সন্দেহ থাকবে তাদের সন্দেহ দূর করে দেবেন। যাদের কোন ব্যাপারে আপত্তি ও প্রশ্ন থাকবে তাদের আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবেন। যারা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে এবং এর বিরোধিতা করতে ও একে বাধা দিতে এগিয়ে আসবে তাদের মোকাবিলায় তিনি এমন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করবেন, যা এই যিকির বা আল্লাহর বাণীর ধারকদের উপযোগী। যারা মেনে নেবে তাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পথনির্দেশনা দান করবেন।

নিজের জীবনকে তাদের সামনে আদর্শ হিসেবে পেশ করবেন। তাদেরকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে অনুশীলন দান করে সারা দুনিয়ার সামনে এমন একটি সমাজকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরবেন যার সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা হবে "যিকির" এর উদ্দেশ্যের বাস্তব ব্যাখ্যা।

যেসব নবুওয়াত অস্বীকারকারী আল্লাহর "যিকির" মানুষের মাধ্যমে আসাকে মেনে নিতে পারেনি তাদের জবাব হিসেবে এ আয়াতটি যেমন চূড়ান্ত তেমনি যেসব হাদীস অস্বীকারকারী নবীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া শুধুমাত্র "যিকির"-কে গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্যও এটি চূড়ান্ত জবাব। তাদের দাবি যদি এ হয়ে থাকে যে, নবী কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি, শুধুমাত্র যিকির পেশ করেছিলেন, অথবা নবীর ব্যাখ্যা নয় শুধুমাত্র যিকিরই গ্রহণযোগ্য, কিংবা এখন আমাদের জন্য শুধুমাত্র যিকির যথেষ্ট, নবীর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই, অথবা এখন একমাত্র 'যিকির'ই নির্ভরযোগ্য অবস্থায় টিকে রয়েছে, নবীর ব্যাখ্যা টিকে নেই আর টিকে থাকলেও তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়— এ চারটি বক্তব্যের মধ্যে যে কোনটিতেই তারা বিশ্বাসী হোক না কেন তাদের এ মতবাদ কুরআনের এ আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল।

যদি তারা প্রথম মতটির প্রবক্তা হয় তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, যে উদ্দেশ্যে যিকিরকে ফেরেশতাদের হাত দিয়ে পাঠাবার বা সরাসরি লোকদের কাছে পৌছিয়ে দেবার পরিবর্তে নবীকে প্রচারের মাধ্যম করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্যই তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আর যদি তারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় মতটির প্রবক্তা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ নিজেই নিজের "যিকির" একজন নবীর মাধ্যমে পাঠিয়ে একটা বাজে কাজ করেছেন। কারণ যিকিরকে শুধুমাত্র মুদ্রিত আকারে নবী ছাড়াই সরাসরি পাঠালে যে ফল হতো নবী আগমনের ফলও তার চাইতে ভিন্ন কিছু নয়।

আর যদি তারা চতুর্থ কথাটির প্রবক্তা হয় তাহলে এটি আসলে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত উভয়টিকেই নাকচ করে দেবার ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর যারা একটি নতুন নবুওয়াত ও নতুন অহীর প্রবক্তা একমাত্র তাদের মতবাদ ছাড়া আর কোন যুক্তিসংগত মতামত থাকে না। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ নিজেই কুরআন মজীদের নাযিলের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে অপরিহার্য গণ্য করছেন আবার নবী যিকিরের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করবেন একথা বলে নবীর প্রয়োজন প্রমাণ করছেন। এখন যদি হাদীস অস্বীকারকারীরা একথা বলে যে, নবীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান নেই তাহলে স্পষ্টতই এ বক্তব্য থেকে দু'টো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথম সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত খতম হয়ে গেছে এবং এখন আমাদের সম্পর্ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শুধুমাত্র তেমন পর্যায়ের রয়ে গেছে যেমন আছে হূদ (আ), সালেহ (আ) ও শোআইব (আ)-এর সাথে। আমরা তাঁদেরকে সত্য নবী বলে মানি তাঁদের প্রতি ঈমান আনি কিন্তু তাঁদের এমন কোন অনুকরণীয় আদর্শ আমাদের কাছে নেই যা আমরা মেনে চলতে পারি। এ যুক্তি মেনে নিলে একটি নতুন নবুওয়াতের প্রয়োজন আপনা থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর কেবলমাত্র একজন নির্বোধই খতমে নবুওয়াতের জন্য পীড়াপীড়ি করতে পারে। এর দ্বিতীয় ফলটি হচ্ছে,

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَٰلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَٰخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

অথবা আচম্কা চলাফেরার মধ্যে তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? কিংবা এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন না যখন তারা নিজেরাই আগামী বিপদের জন্য উৎকন্ঠায় দিন কাটাবে এবং তার হাত থেকে বাঁচার চিন্তায় সতর্ক হবে? তিনি যাই কিছু করতে চান তারা তাঁকে নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতা রাখে না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমাদের রব বড়ই কোমল হৃদয় ও করুণাময়।

আর তারা কি আল্লাহর সৃষ্ট কোন জিনিসই দেখে না, কিভাবে তার ছায়া ডাইনে বাঁয়ে ঢলে পড়ে আল্লাহকে সিজদা করছে?[৪১] সবাই এভাবে দীনতার প্রকাশ করে চলছে। পৃথিবী ও আকাশে যত সৃষ্টি আছে প্রাণসত্তা সম্পন্ন এবং যত ফেরেশতা আছে তাদের সবাই রয়েছে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত।[৪২] তারা কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করে না। ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের ওপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে।

যেহেতু নবীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআন একা তার প্রেরণকারীর বক্তব্য অনুযায়ী পথপ্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়, তাই কুরআনের ভক্তরা যতই জোরেশোরে চিৎকার করে শুধুমাত্র একাকী কুরআনকে যথেষ্ট বলুক না কেন, মূল দাবীদারের দাবী যখন দুর্বল, তখন সাক্ষীদের সাক্ষ যত সবলই হোক না কেন, তা কোন কাজেই লাগতে পারে না। এ অবস্থায় স্বতস্ফূর্তভাবে একটি নতুন কিতাব নাযিল হবার প্রয়োজন কুরআনের দৃষ্টিতেই প্রমাণ হয়ে যায়। আল্লাহ এহেন উদ্ভট বক্তব্যের প্রবক্তাদেরকে ধ্বংস করুন। এভাবে তারা হাদীস অস্বীকারের মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে মূলত দীন ইসলামের শিকড় কাটছে।

৪১. অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট সমস্ত জিনিসের ছায়া থেকে এ আলামতই জাহির হচ্ছে যে, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ সবাই একটি বিশ্বজনীন আইনের

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৭ রুকূ'

আল্লাহর ফরমান হলো, দুই ইলাহ গ্রহণ করো না,[৪৩] ইলাহ তো মাত্র একজন, কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো। সবকিছুই তাঁরই, যা আকাশে আছে এবং যা আছে পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই দীন (সমগ্র বিশ্ব জাহানে) চলছে।[৪৪] এরপর কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে?[৪৫]

তোমরা যে নিয়ামতই লাভ করেছো তাতো আল্লাহরই পক্ষ থেকে, তারপর যখন তোমরা কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হও তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাকো।[৪৬]

শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সবার কপালে আঁকা আছে বন্দেগী ও দাসত্বের টিকা। আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে কারোর সামান্যতম অংশও নেই। কোন জিনিসের ছায়া থাকলে বুঝতে হবে, সেটি একটি জড় বস্তু। আর জড় বস্তু হওয়ার অর্থ হলো, সেটি একটি সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার অনুগত গোলাম। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

৪২. অর্থাৎ শুধু পৃথিবীরই নয়, আকাশেরও এমন সব বস্তু, পিণ্ড বা সত্ত্বা যাদেরকে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ দেব-দেবী এবং আল্লাহর আত্মীয়-স্বজন গণ্য করে এসেছে, তারা আসলে গোলাম ও তাবেদার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মধ্যেও কারোর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোন অংশ নেই।

পরোক্ষভাবে এ আয়াত থেকে এদিকে একটি ইংগিত এসেছে যে, প্রাণসত্তা সম্পন্ন সৃষ্টি কেবলমাত্র দুনিয়াতেই নয় বরং মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও আছে। একথাটিই সূরা শূরার ২৯ আয়াতেও বলা হয়েছে।

৪৩. দুই ইলাহ বা খোদা নাকচ করে দেবার মধ্য দিয়ে দু'য়ের অধিক ইলাহকেও আপনা আপনিই নাকচ করা হয়ে যায়।

৪৪. অন্য কথায় তাঁর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতেই এ সৃষ্টি জগতের সমগ্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا
لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ
أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ
الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ
أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

কিন্তু যখন আল্লাহ সেই সময়কে হটিয়ে দেন তখন সহসাই তোমাদের একটি দল নিজেদের রবের সাথে অন্যকে (এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে) শরীক করতে থাকে,[৪৭] যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করা যায়। বেশ, ভোগ করে নাও শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

এরা যাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানেনা,[৪৮] আমার দেয়া রিযিক থেকে তাদের অংশ নির্ধারণ করে [৪৯]—আল্লাহর কসম, অবশ্যি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেমন করে তোমরা এ মিথ্যা রচনা করেছিলে?

এরা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান,[৫০] সুবহানাল্লাহ! এবং নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে তাদের কাছে যা কাংখিত[৫১] যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। লোকদের থেকে লুকিয়ে ফিরতে থাকে, কারণ এই দুঃসংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে। ভাবতে থাকে, অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? —দেখো, কেমন খারাপ কথা যা এরা আল্লাহর ওপর আরোপ করে।[৫২] যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তারাই তো খারাপ গুণের অধিকারী হবার যোগ্য। আর আল্লাহর জন্য তো রয়েছে মহত্তম গুণাবলী, তিনিই তো সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۞ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۞

৮ রুকূ’

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের বাড়াবাড়ি করার জন্য সংগে সংগে পাকড়াও করতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন একটি জীবকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন সেই সময়টি এসে যায় তখন তা থেকে এক মুহূর্তও আগে পিছে হতে পারে না। আজ এরা দু’টি জিনিস আল্লাহর জন্য স্থির করছে যা এরা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে। আর এদের কন্ঠ মিথ্যা উচ্চারণ করে যে, এদের জন্য শুধু মংগলই মংগল। এদের জন্য তো শুধু একটি জিনিসই আছে এবং তা হচ্ছে দোযখের আগুন। নিশ্চয়ই এদেরকে সবার আগে তার মধ্যে পৌঁছানো হবে।

৪৫. অন্য কথায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ভীতি এবং অন্য কারোর অসন্তোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রবণতা কি তোমাদের জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হবে?

৪৬. অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিরাজমান এটি তাওহীদের একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ। কঠিন বিপদের মুহূর্তে যখন সমস্ত মনগড়া চিন্তা–ভাবনার রঙীন প্রলেপ অন্তর্হিত হয় তখন কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের যে আসল প্রকৃতি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ইলাহ, রব, মালিক ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারের অধিকারী বলে মানে না তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আন’আমের ২৯ ও ৪১ টীকা এবং সূরা ইউনুসের ৩১ টীকা)।

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে কোন বুযর্গ বা দেব–দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতারও নযরানা পেশ করতে থাকে এবং নিজেদের প্রত্যেকটি কথা থেকে একথা প্রকাশ করতে থাকে যে, তাদের মতে আল্লাহর এ মেহেরবানীর মধ্যে উক্ত

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মাদ! তোমার আগেও বহু জাতির মধ্যে আমি রসূল পাঠিয়েছি। (এর আগেও এ রকমই হতো) শয়তান তাদের খারাপ কার্যকলাপকে তাদের সামনে সুশোভন করে দেখিয়েছে (এবং রসূলদের কথা তারা মানেনি)। সেই শয়তানই আজ এদেরও অভিভাবক সেজে বসে আছে এবং এরা মর্মন্তুদ শাস্তির উপযুক্ত হচ্ছে। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি এ মতভেদের তাৎপর্য এদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো। যার মধ্যে এরা ডুবে আছে। এ কিতাব পথনির্দেশ ও রহমত হয়ে নাযিল হয়েছে তাদের জন্য যারা একে মেনে নেবে।[৫৩]

(তুমি দেখছো প্রত্যেক বর্ষাকালে) আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে তিনি সহসাই মৃত জমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে যারা শোনে তাদের জন্য।[৫৩ক]

বুযর্গ বা দেব–দেবীর মেহেরবানীও অন্তরভুক্ত ছিল বরং তারাই মেহেরবানী করে আল্লাহকে মেহেরবানী করতে উদ্বুদ্ধ না করলে আল্লাহ কখনোই মেহেরবানী করতেন না।

৪৮. অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের মাধ্যমে তারা এ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছেনি যে, আল্লাহ সত্যি তাদেরকে তাঁর শরীক করে রেখেছেন এবং নিজের প্রভুত্বের কিছু কাজ অথবা নিজের রাজ্যের কিছু এলাকা তাদের হাতে সোপর্দ করেছেন।

৪৯. অর্থাৎ তাদের জন্য নযরানা, ভেঁট ও অর্ঘ-পেশ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপার্জন ও কৃষি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে রাখতো।

৫০. আরব মুশরিকদের মাবুদদের মধ্যে দেবতাদের সংখ্যা ছিল কম, দেবীদের সংখ্যা ছিল বেশী। আর এ দেবীদের সম্পর্কে তাদের আকীদা ছিল এই যে, তারা আল্লাহর মেয়ে। এভাবে ফেরেশতাদেরকেও তারা আল্লাহর মেয়ে গণ্য করতো।

৫১. অর্থাৎ পুত্র।

৫২. অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য এত বেশী লজ্জাজনক মনে করে থাকে, সেই কন্যা সন্তানকে আল্লাহর জন্য মনোনীত করতে তাদের কোনই দ্বিধা হয় না। অথচ আল্লাহর আদৌ কোন সন্তান থাকতে পারে এরূপ ধারণা করা একটি মহামূর্খতা ও চরম বেয়াদবী ছাড়া আর কিছুই নয়। আরব মুশরিকদের এ কর্মনীতিকে এখানে একটি বিশেষ দিক দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ সম্পর্কে তাদের নিম্নমুখী চিন্তা–ভাবনাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং তাদেরকে একথা বলে দেয়া যে, মুশরিকী আকীদা–বিশ্বাস আল্লাহর ব্যাপারে তাদেরকে দুঃসাহসী ও ঔদ্ধত্যশালী বানিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা এতই বিকারগ্রস্ত ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে যে, এ ধরনের কথা বলা তারা একটুও দোষণীয় মনে করে না।

৫৩. অন্য কথায় এ কিতাব নাযিল হওয়ার কারণে এরা একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। কল্পনা, ভাব–বিলাস, কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে যে অসংখ্য ও বিভিন্ন মতবাদ ও ধর্মে এরা বিভক্ত হয়ে গেছে সেগুলোর পরিবর্তে সবাই একমত হতে পারে সত্যের এমন একটি স্থায়ী বুনিয়াদ এদের নাগালের ভেতরে এসে গেছে। এখন এ নিয়ামতটি এসে যাওয়ার পরও যারা অতীতের অবস্থাকেই প্রাধান্য দিয়ে যাওয়ার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে তাদের পরিণাম ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন যারা এ কিতাবকে মেনে নেবে একমাত্র তারাই সত্য–সরল পথ পাবে এবং তারাই অঢেল বরকত ও রহমতের অধিকারী হবে।

৫৩ ক. অর্থাৎ প্রতি বছর তোমাদের চোখের সামনে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে, পৃথিবী একটি নিরস বিশুষ্ক প্রান্তরের মত পড়ে আছে। সেখানে জীবনের স্পন্দন নেই। ঘাস–লতা–গুল্ম–ফুল–পাতা–সবুজের চিহ্নই নেই। নেই কোন ধরনের পোকা মাকড়ের অস্তিত্ব। এ সময় এসে গেলো বর্ষার মওসুম। দু–চার ফোঁটা বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে আসতেই এ মরা যমীনের বুক চিরে জীবনের তরংগ জেগে উঠতে থাকে। যমীনের বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা অসংখ্য বীজ সহসাই জেগে ওঠে। তাদের প্রত্যেকের মধ্য থেকে গত বর্ষায় জন্মলাভ করার পর মরে যাওয়া উদ্ভিদগুলো আবার মাথা চাড়া দেয়। গরমের মওসুমে নাম–নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল এমন সব অগণিত মৃত্তিকার কীট অকস্মাত আবার দেখা যায় যেমন বিগত বর্ষায় দেখা গিয়েছিল। নিজেদের জীবনে তোমরা এসব বারবার দেখতে থাকো। এরপরও নবীর মুখ থেকে একথা শুনে অবাক হয়ে যাও যে, আল্লাহ মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে পুনরবার জীবিত করবেন। এ অবাক হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তোমাদের পর্যবেক্ষণ বুদ্ধি–জ্ঞানহীন পশুদের পর্যবেক্ষণের মতই। তোমরা বিশ্বজাহানের বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব দেখো কিন্তু তার পেছনে স্রষ্টার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনগুলো দেখো না। অন্যথায় নবীর বর্ণনা শোনার পর তোমাদের মন অনিবার্যভাবে চিৎকার করে বলে উঠতো যে, 'এসব নিদর্শন যথার্থই নবীর বর্ণনাকে সমর্থন করে'।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

৯ রুকূ'

আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, অর্থাৎ নির্ভেজাল দুধ,[৫৪] যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর।

(অনুরূপভাবে) খেজুর গাছ ও আংগুর লতা থেকেও আমি একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকেও পরিণত করো এবং পবিত্র খাদ্যেও।[৫৫] বুদ্ধিমানদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটি নিশানী।

আর দেখো তোমার রব মৌমাছিদেরকে একথা অহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন ঃ[৫৬] তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো।

৫৪. "গোবর ও রক্তের মধ্যস্থিত"-এর অর্থ হচ্ছে, পশু যে খাদ্য খায় তা থেকে তো একদিকে রক্ত তৈরী হয় এবং অন্যদিকে তৈরী হয় মলমূত্র। কিন্তু এ পশুদের স্ত্রী জাতির মধ্যে আবার এ একই খাদ্য থেকে তৃতীয় একটি জিনিসও তৈরী হয়। বর্ণ, গন্ধ, গুণ, উপকারিতা ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে আগের দু'টি থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। তারপর বিশেষ করে গবাদি পশুর মধ্যে এর উৎপাদন এত বেশী হয় যে, তারা নিজেদের সন্তানদের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর মানুষের জন্যও এ উৎকৃষ্টতম খাদ্য বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করতে থাকে।

৫৫. এখানে আনুসংগিকভাবে এ ব্যাপারেও একটি পরোক্ষ আভাস দেয়া হয়েছে যে, ফলের এ রসের মধ্যে এমন উপাদানও রয়েছে যা মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্যে পরিণত হতে পারে, আবার এমন উপাদানও আছে যা পচে মাদক দ্রব্যে পরিণত হয়। এখন মানুষ এ উৎসটি থেকে পাকপবিত্র রিযিক গ্রহণ করবে, না বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে বিনষ্টকারী মদ গ্রহণ করবে, তা তার নিজের নির্বাচন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। শরাব বা মদ যে পাক-পবিত্র রিযিক নয়, এখানে তাও জানা গেলো এবং এটি তার হারাম হওয়ার দিকে আর একটি পরোক্ষ ইংগিত।

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۟ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

তারপর সব রকমের ফলের রস চোসো এবং নিজের রবের তৈরী করা পথে চলতে থাকো।[৫৭] এ মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রংগের শরবত বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে নিরাময় মানুষের জন্য।[৫৮] অবশ্যি এর মধ্যেও একটি নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা–ভাবনা করে।[৫৯]

আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যুদান করেন,[৬০] আবার তোমাদের কাউকে নিকৃষ্টতম বয়সে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, যখন সবকিছু জানার পরেও যেন কিছুই জানে না।[৬১] প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আল্লাহই জ্ঞানেও পরিপূর্ণ এবং ক্ষমতায়ও।

৫৬. অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সূক্ষ্ম ও গোপন ইশারা, যা ইশারাকারী ও ইশারা গ্রহণকারী ছাড়া তৃতীয় কেউ টের পায় না। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শব্দটি 'ইল্‌কা' (মনের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা) ও ইল্‌হাম (গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দান করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে যে শিক্ষা দান করেন তা যেহেতু কোন মক্তব, স্কুল বা শিক্ষায়তনে দেয়া হয় না বরং এমন সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে দেয়া হয় যে, বাহ্যত কাউকে শিক্ষা দিতে এবং কাউকে শিক্ষা নিতে দেখা যায় না, তাই একে কুরআনে অহী, ইল্‌কা ও ইল্‌হাম শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন এ তিনটি শব্দ আলাদা আলাদা পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। অহী শব্দটি নবীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ইল্‌হামকে আউলিয়া ও বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর ইল্‌কা শব্দটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থবোধক এবং সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু কুরআনে এ পারিভাষিক অর্থের পার্থক্যটা পাওয়া যায় না। এখানে আকাশের ওপরও অহী নাযিল হয় এবং সেই অনুযায়ী তার সব ব্যবস্থা পরিচালিত হয় (وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا - حم السجدة) পৃথিবীর ওপরও অহী নাযিল হয় এবং এর ইংগিত পাওয়ার সাথে সাথেই সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকে (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا - الزلزال) ফেরেশ্‌তাদের ওপরও অহী নাযিল হয় এবং সেই মোতাবেক

তারা কাজ করে (اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ - الانفال) মৌমাছিদেরকে তাদের সমস্ত কাজ অহীর (প্রকৃতিগত শিক্ষা) মাধ্যমে শেখানো হয়। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিই দেখা যাচ্ছে। আর এই অহী কেবলমাত্র মৌমাছি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নেই বরং মাছের সাঁতার কাটা, পাখির উড়ে চলা, নবজাত শিশুর দুধ পান করার বিষয়টাও আল্লাহর অহীই শিক্ষা দান করে। তাছাড়া চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই একজন মানুষকে যে অব্যর্থ কৌশল বা নির্ভুল মত অথবা চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ বুঝানো হয় তাও অহী। (وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ - القصص) এ অহী থেকে কোন একজন মানুষও বঞ্চিত নয়। দুনিয়ায় যত নতুন নতুন উদ্ভাবন ও কল্যাণকর আবিষ্কার হয়েছে যত বড় বড় শাসক, বিজেতা, চিন্তানায়ক ও লেখক যুগান্তকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদন করেছেন তার সবের পেছনেই এ অহীর কার্যকারিতা দেখা যায়। বরং সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে এই যে, কখনো বসে বসে একটি কথা মনে হলো অথবা কোন কৌশল মাথায় এলো কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখা গেলো এবং পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেলো যে, অদৃশ্য থেকে পাওয়া সেটি তার জন্য একটি সঠিক পথনির্দেশনা ছিল।

এ বিভিন্ন ধরনের অহীর মধ্যে নবীদেরকে যে অহী করা হতো সেটি ছিল একটি বিশেষ ধরনের অহী। এ অহীটির বৈশিষ্ট অন্যান্য অহী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এতে যাকে অহী করা হয় সে এ অহী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ও নিশ্চিত থাকে। এ অহী হয় আকীদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও নির্দেশাবলী সংক্রান্ত। আর নবী এ অহীর মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ দেবেন এটিই হয় এর নাযিল করার উদ্দেশ্য।

৫৭. 'রবের তৈরী করা পথে' বলে মৌমাছিদের একটি দল যে ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতির আওতাধীনে কাজ করে সেই সমগ্র ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। মৌচাকের আকৃতি ও কাঠামো তাদের দল গঠন প্রক্রিয়া, তাদের বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে কর্মবন্টন, তাদের আহার সংগ্রহের জন্য অবিরাম যাওয়া আসা এবং তাদের নিয়ম মাফিক মধু তৈরী করে তা ক্রমাগত গুদামে সঞ্চয় করতে থাকা—এসব হচ্ছে সেই পথ যা তাদের রব তাদের কাজ করার জন্য এমনভাবে সুগম করে দিয়েছেন যে, তাদের কখনো এ ব্যাপারে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। এটা একটা নির্ধারিত ব্যবস্থা। এরি ভিত্তিতে একটি বাঁধাধরা নিয়মে এ অগণিত চিনিকলগুলো হাজার হাজার বছর ধরে কাজ করে চলেছে।

৫৮. মধু যে একটি উপকারী ও সুস্বাদু খাদ্য তা কারোর অজানা নেই। তাই একথাটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবে তার মধ্যে যে রোগ নিরাময় শক্তি আছে একথাটা তুলনামূলকভাবে একটি অজানা বিষয়। এ জন্য একথাটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। মধু প্রথমত কোন কোন রোগে এমনিতেই উপকারী। কেননা, তার মধ্যে রয়েছে ফুল ও ফলের রস এবং তাদের উন্নত পর্যায়ের গ্লুকোজ। তারপর মধুর একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে, তা নিজে কখনো পচে না এবং অন্য জিনিসকেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের মধ্যে পচন থেকে সংরক্ষিত রাখে। এর ফলে ঔষধ তৈরী করার জন্য তার সাহায্য গ্রহণ করার মত যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্যই ঔষধ নির্মাণ শিল্পে আল-কোহলের পরিবর্তে মধুর ব্যবহার

শত শত বছর থেকে চলে আসছে। তাছাড়া মৌমাছি যদি এমন কোন এলাকায় কাজ করে যেখানে কোন বিশেষ ধরনের বনৌষধি বিপুল পরিমাণ পাওয়া যায় তাহলে সেই এলাকার মধু নিছক মধুই হয় না বরং তা ঐ ঔষধির সর্বোত্তম উপাদান ধারণ করে এবং যে রোগের ঔষধ আল্লাহ ঐ ঔষধির মধ্যে তৈরী করেছেন তার জন্যও তা উপকারী হয়। যদি যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী মৌমাছিদের সাহায্যে এ কাজ করানো হয় এবং বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষের উপাদান তাদের সাহায্যে বের করে তাদের মধু আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষিত হয় তাহলে আমাদের মতে এ মধু ল্যাবরেটরীতে তৈরী উপাদানের চেয়ে বেশী উপকারী প্রমাণিত হবে।

৫৯. এ গোটা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের দ্বিতীয় অংশের সত্যতা সপ্রমাণ করা। দুটি কারণেই কাফের ও মুশরিকরা তাঁর বিরোধিতা করতো। এক, তিনি পরকালীন জীবনের ধারণা পেশ করেন। এ ধারণা চরিত্র ও নৈতিকতার সমগ্র নকশাটাই বদলে দেয়। দুই, তিনি কেবলমাত্র এক আল্লাহকেই মাবুদ, আনুগত্য করার যোগ্য, সংকট থেকে উদ্ধারকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী গণ্য করেন। এর ফলে শিরক ও নাস্তিক্যবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমগ্র জীবন ব্যবস্থাটাই ভ্রান্ত গণ্য হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উপরোক্ত দুটি অংশকে সত্য প্রমাণ করার জন্য এখানে বিশ্বজাহানের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নিজের চারপাশের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখো, সর্বত্র এই যে চিহ্নগুলো পাওয়া যাচ্ছে এগুলো কি নবীর বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে, না তোমাদের কাল্পনিক চিন্তা–ভাবনা ও কুসংস্কারকে সত্য প্রমাণ করছে? নবী বলেন, মরার পর তোমাদের আবার জীবিত করা হবে। তোমরা নবীর একথাকে একটি অসম্ভব কথা বলে গণ্য করছো। কিন্তু প্রতি বর্ষাকালে পৃথিবী এর প্রমাণ পেশ করে। সৃষ্টির পুনরাবর্তন কেবল সম্ভবই নয় বরং প্রতি বর্ষাকালে তোমাদের চোখের সামনে ঘটছে। নবী বলেন, এ বিশ্বজাহান আল্লাহ বিহীন নয়। তোমাদের নাস্তিকরা একথাকে একটি প্রমাণহীন দাবী মনে করছে। কিন্তু গবাদি পশুর গঠনাকৃতি, খেজুর ও আংগুরের উৎপাদন এবং মৌমাছিদের সৃষ্টি কৌশল একথার সাক্ষ দিচ্ছে যে, একজন প্রাজ্ঞ ও করুণাময় রব এ জিনিসগুলোর নকশা তৈরী করেছেন। অন্যথায় এতগুলো পশু, এতসব গাছপালা এবং এত বিপুল সংখ্যক মৌমাছি মিলেমিশে মানুষের জন্য এ নানাবিধ উন্নতমানের, উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও লাভজনক জিনিস প্রতিদিন যথা নিয়মে তৈরী করে যাচ্ছে, এটা কেমন করে সম্ভব ছিল? নবী বলেন, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কেউ উপাস্য, মাবুদ এবং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের হকদার নেই। তোমাদের মুশরিকরা একথায় নাক সিটকায় এবং নিজেদের বহু সংখ্যক উপাস্যের পূজাবেদীতে অর্ঘ ও উপঢৌকনাদি নিবেদন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তোমরা নিজেরাই বলো, এ দুধ, খেজুর, আংগুর ও মধু এগুলো তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, এ নিয়ামতগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদের দান করেছেন? কোন্ দেবী, দেবতা বা অলী তোমাদের আহার পৌঁছাবার এ ব্যবস্থা করেছেন?

৬০. অর্থাৎ আসল ব্যাপার শুধু এতটুকুই নয় যে, তোমাদের প্রতিপালন ও খাদ্য সংস্থানের এ সমগ্র ব্যবস্থাপনাটিই আল্লাহর হাতে রয়েছে বরং প্রকৃত সত্য এটাও যে, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু দু'টোই আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। অন্য কেউ তোমাদের জীবনও দান করতে পারে না, আর মৃত্যুও ঘটাতে পারে না।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿۷۱﴾

১০ রুকূ'

আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের একজনকে আর একজনের ওপর রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তারপর যাদেরকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা এমন নয় যে নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলামদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে, যাতে উভয়ে এ রিযিকে সমান অংশীদার হয়ে যায়। তাহলে কি এরা শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহ মেনে নিতে অস্বীকার করে?[৬২]

৬১. অর্থাৎ এ জ্ঞানবত্তা যা নিয়ে তোমরা গর্ব ও অহংকার করে বেড়াও এবং যার বদৌলতে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তাও আল্লাহর দান। তোমরা নিজেদের চোখে নিজেদের জীবনের একটি বিস্ময়কর শিক্ষণীয় দৃশ্য দেখে থাকো। যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ দীর্ঘায়ু দান করেন, অনেক বেশী বয়স হয়ে যায়, তখন এ ব্যক্তিই যে কখনো তার যৌবনকালে অন্যকে জ্ঞান দিতো, সে কেমন একটা লোলচর্ম বৃদ্ধে এবং অথর্ব–অক্ষম একটা নিরেট মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়, যার কোন হুঁশ–জ্ঞান থাকে না।

৬২. বর্তমানকালে এ আয়াত থেকে বড়ই অদ্ভুত ও উদ্ভট অর্থ বের করা হয়েছে। কুরআনের আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি আয়াতের আলাদা আলাদা অর্থ করলে কেমন অন্তহীন অপব্যাখ্যার দরজা খুলে যায় এটা হচ্ছে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা এ আয়াতটিকে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের বুনিয়াদ এবং অর্থনৈতিক বিধি–ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা গণ্য করেছেন। তাদের মতে আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, যাদেরকে আল্লাহ রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তাদের নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলাম ও চাকর বাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া উচিত। যদি বিলিয়ে দেয়া না হয় তাহলে তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে। অথচ এ সমগ্র আলোচনার মধ্যে কোথাও অর্থনৈতিক বিধি–ব্যবস্থা বর্ণনার আদৌ কোন সুযোগই নেই। প্রথম থেকে সমগ্র ভাষণটিই চলছে শিরককে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও তাওহীদকে সত্য প্রমাণ করার জন্য এবং সামনের দিকেও এ একই বিষয়বস্তুই একের পর এক এগিয়ে চলছে। এ আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ অর্থনৈতিক বিধি–ব্যবস্থার একটি ধারা বর্ণনা করার কোন সুযোগই কি এখানে আছে? আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রেখে বিচার করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, এখানে এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়বস্তুরই আলোচনা চলছে। এখানে একথা

প্রমাণ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদে যখন নিজেদের গোলাম ও চাকর বাকরদেরকে সমান মর্যাদা দাও না—অথচ এ সম্পদ আল্লাহর দেয়া—তখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতাহীন গোলামদেরকেও শরীক করা এবং ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ গোলামদেরকেও তাঁর সাথে সমান অংশীদার গণ্য করাকে তোমরা কেমন করে সঠিক মনে করো?

সূরা রূমের ২৮ আয়াতে এ একই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। সেখানে এর শব্দগুলো হচ্ছে ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"আল্লাহ তোমাদের সামনে একটি উপমা তোমাদের সত্তা থেকেই পেশ করেন। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তাতে কি তোমাদের গোলাম তোমাদের সাথে শরীক আছে? আর এভাবে শরীক বানিয়ে তোমরা ও তারা কি সমান সমান হয়ে গিয়েছ? এবং তোমরা কি তাদেরকে ঠিক তেমনি ভয় পাও যেমন তোমাদের সমপর্যায়ের লোকদেরকে ভয় পাও? এভাবে আল্লাহ খুলে খুলে নিশানী বর্ণনা করেন তাদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।"

দু'টি আয়াতের তুলনামূলক আলোচনা করলে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় স্থানেই একই উদ্দেশ্যে একই উপমা বা দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এদের একটি অন্যটির ব্যাখ্যা করছে।

সম্ভবত اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ বাক্যাংশ থেকেই ঐ বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। উপমা বর্ণনার পর সাথে সাথেই এ বাক্যাংশটি দেখে তারা মনে করেছে নিশ্চয়ই এর অর্থ এই হবে যে অধীনস্থদের মধ্যে রিযিক বিলিয়ে না দেয়াটাই মূলত আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি। অথচ যে ব্যক্তি কুরআনে সামান্য পারদর্শিতাও রাখেন তিনিই জানেন যে আল্লাহর নিয়ামতের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো এ কিতাবের দৃষ্টিতে আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিষয়টির কুরআনে এত বেশী পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে, তিলাওয়াত ও চিন্তা-গবেষণায় অভ্যস্ত লোকেরা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন না। অবশ্যি সূচীপত্রের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ রচনাকারীগণ এ ব্যাপারটি নাও জানতে পারেন।

আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকৃতির এই তাৎপর্যটি অনুধাবন করার পর এ বাক্যাংশের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরা যখন প্রভু ও গোলামের পার্থক্য ভাল করেই জানে এবং নিজেদের জীবনে সর্বক্ষণ এ পার্থক্যের দিকে নজর রাখে তখন একমাত্র আল্লাহর ব্যাপারেই কি এরা এত অবুঝ হয়ে গেছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ মনে করার এবং তাঁর কাছ থেকে এরা যেসব নিয়ামত লাভ করেছে সেগুলোর জন্য তাঁর বান্দাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোকে জরুরী মনে করে?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۷۳﴾ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۴﴾

আর আল্লাহই তোমাদের জন্য তোমাদের সমজাতীয় স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এ স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি দান করেছেন এবং ভাল ভাল জিনিস তোমাদের খেতে দিয়েছেন। তারপর কি এরা (সবকিছু দেখার ও জানার পরও) বাতিলকে মেনে নেয়[৬৩] এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে? আর তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার পূজা করে যাদের না আকাশ থেকে তাদের কিছু রিযিক দেবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, না পৃথিবী থেকে[৬৪]? কাজেই আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরী করো না,[৬৫] আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

৬৩. 'বাতিলকে মেনে নেয়' অর্থাৎ এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য ভাঙা-গড়া, আশা-আকাংখা পূর্ণ করা, সন্তান দেয়া, রুজি-রোজগার দেয়া, বিচার-আচার ও মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ করানো এবং রোগ-শোক থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি কতিপয় দেব-দেবী, জিন এবং অতীতের বা পরবর্তীকালের কোন মহাপুরুষের হাতে রয়েছে।

৬৪. এসব নিয়ামত আল্লাহর দেয়া, একথা যদিও মক্কার মুশরিকরা অস্বীকার করতো না এবং এসব নিয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ মেনে নিতেও তারা গররাযী ছিল না কিন্তু তারা যে ভুলটা করতো সেটা ছিল এ যে, এই নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সাথে সাথে তারা নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বহু সত্তার কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো যাদেরকে তারা কোন প্রকার প্রমাণ ও সনদপত্র ছাড়াই এ নিয়ামতগুলো প্রদানের ক্ষেত্রে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল। এ জিনিসটিকেই কুরআন "আল্লাহর অনুগ্রহের অস্বীকৃতি" বলে গণ্য করছে। যে উপকার করলো, তার উপকারের জন্য যে উপকার করেনি তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মূলত উপকারীর উপকার অস্বীকৃতিরই নামান্তর, কুরআনে এ কথাটিকে একটি সাধারণ নীতি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআন একথাটিকেও একটি মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করছে যে, বিনা যুক্তি-প্রমাণে উপকারী সম্পর্কে ধারণা করা যে, তিনি নিজ অনুগ্রহ ও দয়ার বশে এ উপকার করেননি বরং অমুক ব্যক্তির অছিলায় বা অমুক ব্যক্তির সুবিধার্থে

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوۡكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلٰى شَىۡءٍ وَّمَنۡ رَّزَقۡنٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنۡفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَّجَهۡرًا ؕ هَلۡ يَسۡتَوٗنَ ؕ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ ؕ بَلۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۷۵﴾

আল্লাহ একটি উপমা দিচ্ছেন।[৬৬] একজন হচ্ছে গোলাম, যে অন্যের অধিকারভুক্ত এবং নিজেও কোন ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয়জন এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ভাল রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খুব খরচ করে। বলো, এরা দু'জন কি সমান? —আলহামদুল্লিাহ,[৬৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ সোজা কথাটি) জানে না।[৬৮]

অথবা অমুক ব্যক্তির সুপারিশক্রমে কিংবা অমুকের হস্তক্ষেপ করার কারণে এ উপকার করেছেন, এটাও মূলত তার উপকারের প্রতি অস্বীকৃতিরই শামিল।

ইনসাফ ও সাধারণ বিবেক–বুদ্ধি এ মৌলিক কথা দু'টিকে পুরোপুরি সমর্থন করে। সামান্য চিন্তা–ভাবনা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিই এর যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারে। মনে করুন, কোন অভাবী ব্যক্তির প্রতি করুণা করে আপনি তাকে সাহায্য করলেন এবং সে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে এমন এক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো যার এ সাহায্যে কোন হাতই ছিল না। এ অবস্থায় আপনি নিজের উদার মনোবৃত্তির কারণে তার এ অবাঞ্ছিত আচরণকে যতই উপেক্ষা করুন না কেন এবং আগামীতে নিজের সাহায্য যতই জারী রাখুন না কেন, তবুও মনে মনে নিশ্চয়ই ভাববেন, এ লোকটি আসলে বড়ই নির্লজ্জ ও অকৃতজ্ঞ। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি আপনি জানতে পারেন, তার এ কাজটি করার কারণ এই ছিল যে, সে মনে করে, আপনি তাকে যা কিছু সাহায্য করেছেন তার পেছনে আপনার সততা ও দানশীলতার মনোবৃত্তি কার্যকর ছিল না বরং সবকিছু করেছিলেন ঐ ব্যক্তির খাতিরে, অথচ আসল ঘটনা তা ছিল না, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই একে নিজের অপমান মনে করবেন। আপনার কাছে তার এ উদ্ভট ব্যাখ্যার অর্থ এ হবে যে, সে আপনার সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণা রাখে এবং আপনাকে দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল মানুষ বলে মনে করে না। বরং আপনাকে মনে করে একজন বন্ধু বৎসল লোক। বন্ধুর কথায় আপনি ওঠা বসা করেন। কয়েকজন পরিচিত বন্ধুর মাধ্যমে যদি কেউ এসে যায় তাহলে আপনি সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের খাতিরে তাকে সাহায্য করেন অন্যথায় আপনার আঙুলের ফাঁক দিয়ে দানের একটা সিকিও গলতে পারে না।

৬৫. 'আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরী করো না'— অর্থাৎ আল্লাহকে দুনিয়ার রাজা–মহারাজা ও বাদশাহ–শাহানশাহদের সমপর্যায়ে রেখে বিচার করো না। রাজা–বাদশাহদের অনুচর, সভাসদ ও মোসাহেবদের মাধ্যম ছাড়া তাদের কাছে কেউ নিজের আবেদন নিবেদন পৌছাতে পারে না। ঠিক তেমনি আল্লাহর ব্যাপারেও তোমরা এ ধারণা করতে থাকো যে, তিনি নিজের শাহী মহলে ফেরেশতা, আউলিয়া ও অন্যান্য সভাসদ পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন এবং এদের মাধ্যমে ছাড়া তাঁর কাছে কারোর কোন কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۙ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۙ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

আল্লাহ আর একটি উপমা দিচ্ছেন। দু'জন লোক। একজন বধির ও বোবা, কোন কাজ করতে পারে না। নিজের প্রভুর ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে আছে। যেদিকেই তাকে পাঠায় কোন ভাল কাজ তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়জন ইনসাফের হুকুম দেয় এবং নিজে সত্য সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত আছে। বলো, এরা দু'জন কি সমান?[৬৯]

৬৬. অর্থাৎ যদি উপমার সাহায্যে কথা বুঝতে হয় তাহলে আল্লাহ সঠিক উপমা দিয়ে তোমাদের সত্য বুঝিয়ে দেন। তোমরা যেসব উপমা দিচ্ছো সেগুলো ভুল। তাই তোমরা সেগুলো থেকে ভুল ফলাফল গ্রহণ করে থাকো।

৬৭. প্রশ্ন ও আলহাম্‌দুলিল্লাহ এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রয়ে গেছে। এ ফাঁক পূরণ করার জন্য আলহাম্‌দুলিল্লাহ এর মধ্যেই একটি তাৎপর্যময় ইংগিত রয়ে গেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, নবীর মুখ থেকে একথা শুনে মুশরিকদের পক্ষে এ দু'টি সমান এ ধরনের জবাব দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। নিশ্চয়ই এর জবাবে কেউ না কেউ পরিষ্কারভাবে একথা স্বীকার করে থাকতে পারে যে, আসলে দু'টি সমান নয়, আবার কেউ এ ভয়ে নীরবতা অবলম্বন করে থাকতে পারে যে, স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দেবার মাধ্যমে তার অনিবার্য ফলাফলকেও স্বীকার করে নিতে হবে এবং এর ফলে স্বতস্ফূর্তভাবেই তাদের শির্‌ক বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই নবী উভয়ের জবাব পেয়ে বললেন, আলহাম্‌দুলিল্লাহ। স্বীকারকারীদের স্বীকারোক্তির পরও আলহামদুলিল্লাহ এবং নীরবতা পালনকারীদের নীরবতার ওপরও আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম অবস্থাটিতে এর অর্থ হয়, "আল্লাহর শোকর, অন্তত এতটুকু কথা তো তোমরা বুঝতে পেরেছো।" দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হয়, "নীরব হয়ে গেছে? আলহাম্‌দুলিল্লাহ, নিজেদের সমস্ত হঠকারিতা সত্ত্বেও দু'টি অবস্থা সমান বলে দেবার হিম্মত তোমাদেরও নেই।"

৬৮. অর্থাৎ যদিও তারা মানুষের মধ্যে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাধরের মধ্যকার পার্থক্য অনুভব করে এবং এ পার্থক্য সামনে রেখেই প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা আচরণ করে, তবুও তারা এমনি মূর্খ ও অবুঝ সেজে আছে যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে না। স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, অধিকার, শক্তিমত্তা সবকিছুতেই তারা সৃষ্টিকে শরীক মনে করছে এবং সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ করছে যা একমাত্র স্রষ্টার সাথেই করা যেতে পারে। উপায় উপকরণের ওপর নির্ভরশীল এ জগতে কারোর কাছে কোন জিনিস চাইতে হলে আমরা গৃহস্বামীর কাছেই চেয়ে থাকি, চাকর বাকরদের কাছে চাই না। কিন্তু সমগ্র দয়া-দাক্ষিণ্যের উৎস যেই সত্তা, তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۷۷﴾

১১ রুকূ'

আর আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন সত্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে[৭০] এবং কিয়ামত সংঘটিত হবার ব্যাপারটি মোটেই দেরী হবে না, চোখের পলকেই ঘটে যাবে বরং তার চেয়েও কম সময়ে।[৭১] আসলে আল্লাহ সবকিছুই করতে পারেন।

পূর্ণ করার জন্য যখন সচেষ্ট হই, তখন সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিককে বাদ দিয়ে তাঁর বান্দাদের কাছে হাত পাতি।

৬৯. প্রথম উপমায় আল্লাহ ও বানোয়াট মাবুদদের পার্থক্যটা কেবলমাত্র ক্ষমতা ও অক্ষমতার দিক দিয়ে সুস্পষ্ট করা হয়েছিল। এখন এ দ্বিতীয় উপমায় সেই পার্থক্যটিকে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে গুণাবলীর দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ও এ বানোয়াট মাবুদদের মধ্যে ফারাক শুধুমাত্র এতটুকুই নয় যে, একজন ক্ষমতাধর মালিক এবং অন্যজন ক্ষমতাহীন গোলাম বরং এ ছাড়াও তাদের মধ্যে এ ফারাকটিও রয়েছে যে, এ গোলাম তোমাদের ডাকও শোনে না, তার জবাবও দিতে পারে না এবং নিজের ক্ষমতাবলে কোন একটা কাজও করতে পারে না। তার নিজের সারাটি জীবন তার মালিক ও প্রভুর সত্তার ওপর নির্ভরশীল। আর প্রভু যদি তার ওপর কোন কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে সে কিছুই করতে পারে না। অন্যদিকে প্রভুর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি কেবল বক্তাই নন বরং জ্ঞানী বক্তা। তিনি দুনিয়াকে ইনসাফের হুকুম দেন। তিনি কেবল কাজ করার ক্ষমতাই রাখেন না বরং যা করেন তা সঠিক ও ন্যায়সংগতভাবেই করেন, সততা ও নির্ভুলতার সাথে করেন। তাহলে বলো, এ ধরনের প্রভু ও গোলামকে তোমরা সমান মনে করো কেমন করে? এটা তোমাদের কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তা?

৭০. পরবর্তী বাক্য থেকে বুঝা যায়, এটি আসলে মক্কার কাফেরদের একটি প্রশ্নের জবাব। তারা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি আমাদের যে কিয়ামতের আগমনের খবর দিচ্ছো তা যদি সত্যি সত্যিই আসে, তাহলে তা কবে কোন্ তারিখে আসবে? এখানে তাদের প্রশ্ন উদ্ধৃত না করে তার জবাব দেয়া হচ্ছে।

৭১. অর্থাৎ কিয়ামত আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কোন দীর্ঘ কালীন পর্যায়ে সংঘটিত হবে না। তার আসার আগে তোমরা দূর থেকে তাকে আসতে দেখবে না এবং এর মাঝখানে তোমরা নিজেদেরকে সামলে নিয়ে তার জন্য কিছু প্রস্তুতিও করতে পারবে না। যেকোন দিন যেকোন মুহূর্তে চোখের পলকে বা তার চেয়েও কম সময়ে তা এসে যাবে। কাজেই যে চিন্তা–ভাবনা করতে চায় তার গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করা উচিত এবং নিজের

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾

আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদের বের করেছেন এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার মত হৃদয় দিয়েছেন,[৭২] যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭৩]

এরা কি কখনো পাখিদের দেখেনি, আকাশ নিঃসীমে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য।

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস। তিনি পশুদের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমনসব ঘর তৈরী করে দিয়েছেন[৭৪] যেগুলোকে তোমরা সফর ও স্বগৃহে অবস্থান উভয় অবস্থায়ই সহজে বহন করতে পারো।[৭৫] তিনি পশুদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের জন্য পরিধেয় ও ব্যবহার-সামগ্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগবে।

মনোভাব ও কর্মনীতি সম্পর্কে যে ফায়সালাই করতে হয় শীঘ্রই করা দরকার। "এখন তো কিয়ামত অনেক দূরে, যখন তা আসতে থাকবে তখনই আল্লাহর সাথে একটা মিটমাট করে নেবো," কারো এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করে তার ওপর ভরসা করে বসে থাকা উচিত নয়। তাওহীদ সম্পর্কে ভাষণ দিতে দিতে তার মাঝখানে হঠাৎ এভাবে কিয়ামতের আলোচনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, লোকেরা যেন তাওহীদ ও শিরকের মাঝখানে কোন

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

তিনি নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয় তৈরী করেছেন এবং তোমাদের এমন পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদের গরম থেকে বাঁচায়[৭৬] আবার এমন কিছু অন্যান্য পোশাক তোমাদের দিয়েছেন যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে।[৭৭] এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করেন,[৭৮] হয়তো তোমরা অনুগত হবে।

একটি আকীদা নির্বাচন করার ব্যাপারটিকে নিছক একটি তাত্ত্বিক ব্যাপার মনে না করে বসে। তাদের এ অনুভূতি থাকা উচিত যে, কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে যে কোন সময় হঠাৎ একটি ফায়সালার সময় এসে যাবে এবং সে সময় এ নির্বাচনের সঠিক বা ভুল হওয়ার ওপর মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে। এ সতর্কবাণীর পর আবার আগে থেকে চলে আসা সেই একই আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

৭২. অর্থাৎ এমনসব উপকরণ যার সাহায্যে তোমরা দুনিয়ায় সব রকমের জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কাম চালাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছো। জন্মকালে মানব সন্তান যত বেশী অসহায় ও অজ্ঞ হয় এমনটি অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপকরণাদির (শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বিবেক ও চিন্তাশক্তি) সাহায্যেই সে উন্নতি লাভ করে পৃথিবীর সকল বস্তুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার এবং তাদের ওপর রাজত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে।

৭৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ তোমাদের এসব অগণিত নিয়ামত দান করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এ নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশী অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে যে, এ কান দিয়ে মানুষ সব কিছু শোনে কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর কথা শোনে না, এ চোখ দিয়ে সবকিছু দেখে কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে না এবং এ মস্তিষ্ক দিয়ে সবকিছু চিন্তা করে কিন্তু শুধুমাত্র একথা চিন্তা করে না যে, আমার যে অনুগ্রহকারী আমার প্রতি এসব অনুগ্রহ করেছেন তিনি কে?

৭৪. অর্থাৎ পশুচর্মের তাঁবু। আরবে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

৭৫. অর্থাৎ যখন কোথাও রওয়ানা হয়ে যেতে চাও তখন তাকে সহজে গুটিয়ে ভাঁজ করে নিয়ে বহন করতে পারো। আবার যখন কোথাও অবস্থান করতে চাও তখন অতি সহজেই ভাঁজ খুলে খাটিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলতে পারো।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে হে মুহাম্মাদ! পরিষ্কারভাবে সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া তোমার আর কোন দায়িত্ব নেই। এরা আল্লাহর অনুগ্রহ জানে, কিন্তু সেগুলো অস্বীকার করে,[৭৯] *আর এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এমন যারা সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।*

৭৬. ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার কথা না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, গরমের সময় কাপড়ের ব্যবহার মানব সভ্যতার পূর্ণতার পর্যায়ভুক্ত। আর পূর্ণতার পর্যায়ের উল্লেখ করার পর তার নিম্নবর্তী প্রাথমিক পর্যায়গুলোর উল্লেখের কোন প্রয়োজন থাকে না। অথবা একথাটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এ জন্য যে, যেসব দেশে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের লু-হাওয়া চলে সেখানে শীতকালীন পোশাকের পরিবর্তে গ্রীষ্মকালীন পোশাকের গুরুত্ব হয় বেশী। এসব দেশে লোকেরা যদি মাথা, ঘাড়, কান ও সারা দেহ ভালভাবে না ঢেকে বাইরে বের হয় তাহলে গরম বাতাসে তাদের শরীর ঝলসে যাবে। বরং কোন কোন সময় তো তাদের শুধুমাত্র চোখ দু'টো বাদ দিয়ে সমস্ত চেহারাটাই ঢেকে নিতে হয়।

৭৭. অর্থাৎ বর্ম।

৭৮. নিয়ামত পূর্ণ বা সম্পূর্ণ করার মানে হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ জীবনের প্রতিটি বিভাগে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন এবং তারপর এক একটি প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন। যেমন এ বিষয়টিই ধরা যায়। বাইরের প্রভাব থেকে মানুষের দেহ সংরক্ষণ কাম্য ছিল। তাই আল্লাহ কোন্ কোন্ দিক থেকে কেমন ধরনের কি পরিমাণ উপকরণ তৈরী করে দিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ যদি কেউ লিখতে বসে তাহলে একটি বই তৈরী হয়ে যাবে। এটি যেন পোশাক ও বাসস্থানের দিক দিয়ে আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা। অথবা যেমন খাদ্যোপকরণের ব্যাপারটিই ধরা যায়। এ জন্য কত বিশাল পর্যায়ে কত বৈচিত্র সহকারে কেমন ধরনের সব ছোটখাটো প্রয়োজনের প্রতিও নজর রেখে মহান আল্লাহ অসংখ্য অগণিত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। যদি কেউ এগুলো পর্যালোচনা করতে চায় তাহলে হয়তো শুধুমাত্র খাদ্যের প্রকারভেদ এবং খাদ্য বস্তুগুলোর তালিকা তৈরী করার জন্য একটি বিপুলাকার গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। এটি যেন খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা। এভাবে মানব জীবনের এক একটি ক্ষেত্র ও বিভাগ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন।

৭৯. অস্বীকার বলতে সেই একই আচরণের কথা বুঝানো হয়েছে, যার উল্লেখ আমরা আগেই করে এসেছি। মক্কার কাফেররা একথা অস্বীকার করতো না যে, এ সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ তাদের প্রতি করেছেন। কিন্তু তাদের আকীদা ছিল, তাদের বুযর্গ ও দেবতাদের

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۚ
فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

১২ রুকূ'

(সেদিন কি ঘটবে, সে ব্যাপারে এদের কি কিছুমাত্র হুঁশও আছে) যেদিন আমি উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী[৮০] দাঁড় করাবো, তারপর কাফেরদের যুক্তি-প্রমাণ ও সাফাই পেশ করার সুযোগও দেয়া হবে না।[৮১] আর তাদের কাছে তাওবা ও ইস্‌তিগ্‌ফারেরও দাবী জানানো হবে না।[৮২] জালেমরা যখন একবার আযাব দেখে নেবে তখন তাদের আযাব আর হাল্‌কা করা হবে না এবং তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্য বিরামও দেয়া হবে না। আর দুনিয়ায় যারা শির্‌ক করেছিল তারা যখন নিজেদের তৈরী করা শরীকদেরকে দেখবে তখন বলবে, "হে আমাদের রব! এরাই হচ্ছে আমাদের তৈরী করা শরীক, যাদেরকে আমরা তোমাকে বাদ দিয়ে ডাকতাম।" একথায় তাদের ঐ মাবুদরা তাদের পরিষ্কার জবাব দিয়ে বলবে, "তোমরা মিথ্যুক।"[৮৩] সে সময় এরা সবাই আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়বে এবং এদের সমস্ত মিথ্যা উদ্ভাবন হাওয়া হয়ে যাবে, যা এরা দুনিয়ায় করে বেড়াতো।[৮৪]

হস্তক্ষেপের ফলে তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করা হয়েছে। আর একারণেই তারা এসব অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সময় ঐসব বুযর্গ ও দেবতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো বরং তাদের প্রতি কিছুটা বেশী করেই প্রকাশ করতো। একাজটিকেই আল্লাহ নিয়ামত অস্বীকৃতি এবং অকৃতজ্ঞতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৮০. অর্থাৎ সেই উম্মতের নবী বা এমন কোন ব্যক্তি নবীর তিরোধানের পর যিনি সেই উম্মতকে তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদেরকে শিরক ও মুশরিকী চিন্তা-ভাবনা, ভ্রষ্টাচার ও কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহি করার ব্যাপারে সজাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষ দেবেন

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٨﴾

যারা নিজেরাই কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েছে তাদেরকে আমি আযাবের পর আযাব দেবো,[৮৫] দুনিয়ায় তারা যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো তার বদলায়।

যে, তিনি তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই যাকিছু তারা করেছে তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং জেনে বুঝেই করেছে।

৮১. এর অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে সাফাই পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অপরাধগুলো এমন অকাট্য ও অনস্বীকার্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তাদের সাফাই পেশ করার আর কোন অবকাশই থাকবে না।

৮২. অর্থাৎ সে সময় তাদেরকে একথা বলা হবে না যে, এখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি—অপরাধগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও। কারণ সেটা হবে ফায়সালার সময়। ক্ষমা চাওয়ার সময় তার আগে শেষ হয়ে যাবে। কুরআন ও হাদীস উভয় সূত্রই একথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দুনিয়াতেই তাওবা ও ইস্তিগ্ফার করতে হবে, আখেরাতে নয়। আবার দুনিয়াতেও এর সুযোগ শুধুমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ মৃত্যুর চিহ্নগুলো ফুটে না ওঠে, যখন মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, তার শেষ সময় পৌঁছে গেছে। এ সময় তার তওবা গ্রহণীয় নয়। মৃত্যুর সীমান্তে পৌঁছার সাথে সাথেই মানুষের কর্মের অবকাশ খতম হয়ে যায় এবং তখন শুধুমাত্র পুরস্কার ও শাস্তি দানের পাট বাকি থেকে যায়।

৮৩. এর মানে এই নয় যে, তারা মূল ঘটনাটি অস্বীকার করবে এবং বলবে যে, মুশরিকরা তাদেরকে সংকট উত্তরণকারী ও প্রয়োজন পূর্ণকারী বলে ডাকত না। বরং তারা আসলে এ ঘটনা সম্পর্কে তাদের নিজেদের জানা ও অবহিত থাকা এবং এর প্রতি তাদের সম্মতি ও দায়িত্ব অস্বীকার করবে। তারা বলবে, আমরা কখনো তোমাদের একথা বলিনি যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের ডাকো এবং তোমাদের এ কাজের প্রতি আমরা কখনো সন্তুষ্টও ছিলাম না। বরং তোমরা যে আমাদের ডেকে চলছো তাতো আমরা জানতামই না। তোমরা যদি প্রার্থনা শ্রবণকারী, প্রার্থনা পূরণকারী, হস্ত ধারণকারী ও সংকট নিরসনকারী বলে আমাদের মনে করে থেকে থাকো তাহলে তো এটা ছিল তোমাদের মনগড়া একটা সর্বৈব মিথ্যা কথা। কাজেই এর সব দায়-দায়িত্বই তোমাদের। এখন এ দায়িত্বের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছো কেন?

৮৪. অর্থাৎ তা সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। দুনিয়ায় তারা যেসব নির্ভর বানিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের ওপর ভরসা করতো, সেসব অদৃশ্য হয়ে যাবে। কোন অভিযোগের

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

(হে মুহাম্মাদ! এদেরকে সেই দিন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করিয়ে দেবো, যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে এবং এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে আসবো। (আর এ সাক্ষের প্রস্তুতি হিসেবে) আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে[৮৬] এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে। ৮৭

প্রতিকারকারীকে সেখানে অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য পাবে না। কোন সংকট নিরসনকারীকে তাদের সংকট নিরসন করার জন্য সেখানে পাওয়া যাবে না। কেউ সেখানে এগিয়ে এসে একথা বলবে না যে, এ ব্যক্তিকে কিছু বলো না এ আমার লোক ছিল।

৮৫. অর্থাৎ একটা আযাব হবে কুফরী করার জন্য এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়ার জন্য হবে আর একটা আযাব।

৮৬. অর্থাৎ এমন প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, যার ওপর হিদায়াত ও গোমরাহী এবং লাভ ও ক্ষতি নির্ভর করে, যা জানা সঠিক পথে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভুলক্রমে কিছু কিছু তাফসীর লেখক تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ বাক্যাংশটি এবং এর সম–অর্থবোধক আয়াতগুলোর অর্থ করে এভাবে যে, কুরআনে সবকিছু বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর তারা নিজেদের এ বক্তব্য সত্য প্রমাণ করার জন্য কুরআন থেকে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির অদ্ভূত অদ্ভূত বিষয়বস্তু টেনে বের করতে থাকে।

৮৭. অর্থাৎ যারা আজ এ কিতাবটি মেনে নেবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে এ কিতাব জীবনের সব ক্ষেত্রে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে, একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে এবং এ কিতাব তাদেরকে এ সুসংবাদ দেবে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার দিন আল্লাহর আদালত থেকে তারা সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে। অন্যদিকে যারা এ কিতাব মানবে না তারা যে কেবল হিদায়াত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয় বরং কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর নবী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে দাঁড়াবেন তখন এ দলীলটিই হবে তাদের একটি জবরদস্ত প্রমাণ। কারণ নবী একথা প্রমাণ করে দেবেন যে, তিনি তাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছিলেন যার মধ্যে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিল।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

১৩ রুকূ'

আল্লাহ ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন[৮৮] এবং অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন।[৮৯] তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো।

৮৮. এ ছোট্ট বাক্যটিতে এমন তিনটি জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে যেগুলোর ওপর সমগ্র মানব সমাজের সঠিক অবকাঠামোতে ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকা নির্ভরশীল।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আদল বা ন্যায়পরতা। দু'টি স্থায়ী সত্যের সমন্বয়ে এর ধারণাটি গঠিত। এক, লোকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সমতা থাকতে হবে। দুই, প্রত্যেককে নির্দ্বিধায় তার অধিকার দিতে হবে। আমাদের ভাষায় এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য "ইনসাফ" শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ থেকে অনর্থক এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দু' ব্যক্তির মধ্যে "নিস্ফ" "নিস্ফ" বা আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বন্টিত হতে হবে। তারপর এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। আসলে "আদল" সমতা বা সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় দাবী করে। কোন কোন দিক দিয়ে "আদল" অবশ্যই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাম্য চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আবার কোন কোন দিক দিয়ে সাম্য সম্পূর্ণ "আদল" বিরোধী। যেমন পিতা মাতা ও সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মজীবী ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মজীবীদের মধ্যে বেতনের সাম্য। কাজেই আল্লাহ যে জিনিসের হুকুম দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। এ হুকুমের দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে ইহ্সান বা পরোপকার তথা সদাচার, ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার, সহানুভূতিশীল আচরণ, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা দান, একজন অপর জনের মর্যাদা রক্ষা করা, অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় কিছু কমে রাযী হয়ে যাওয়া —এ হচ্ছে আদলের অতিরিক্ত এমন একটি জিনিস যার গুরুত্ব সামষ্টিক জীবনে আদলের চাইতেও বেশী। আদল যদি হয় সমাজের বুনিয়াদ তাহলে ইহ্সান হচ্ছে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। আদল যদি সমাজকে কটুতা ও তিক্ততা থেকে বাঁচায় তাহলে ইহ্সান তার মধ্যে সমাবেশ ঘটায় মিষ্ট মধুর স্বাদের। কোন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বক্ষণ তার অধিকার কড়ায় গণ্ডায় মেপে মেপে

আদায় করতে থাকবে এবং তারপর ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অধিকার আদায় করে নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে, আবার অন্যদিকে অন্যদের অধিকারের পরিমাণ কি তা জেনে নিয়ে কেবলমাত্র যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই আদায় করে দেবে, এরূপ কট্টর নীতির ভিত্তিতে আসলে কোন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। এমনি ধরনের একটি শীতল ও কাঠখোট্টা সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকবে না ঠিকই কিন্তু ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য, ত্যাগ, আন্তরিকতা, মহানুভবতা ও মংগলাকাংখার মত জীবনের উন্নত মূল্যবোধগুলোর সৌন্দর্য সুষমা থেকে সে বঞ্চিত থেকে যাবে। আর এগুলোই মূলত এমন সব মূল্যবোধ যা জীবনে সুন্দর আবহ ও মধুর আমেজ সৃষ্টি করে এবং সামষ্টিক মানবীয় গুণাবলীকে বিকশিত করে।

তৃতীয় যে জিনিসটির এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করা এবং তাদের সাথে সদাচার করা। এটি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ইহ্সান করার একটি বিশেষ ধরন নির্ধারণ করে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ নিজের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দুঃখে ও আনন্দে তাদের সাথে শরীক হবে এবং বৈধ সীমানার মধ্যে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে। বরং এও এর অর্থের অন্তরভুক্ত যে, প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদের ওপর শুধুমাত্র নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করবে না বরং একই সংগে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারও স্বীকার করবে। আল্লাহর শরীয়াত প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তাদের পরিবারের অভাবী লোকেরা যেন অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তার দৃষ্টিতে কোন সমাজের এর চেয়ে বড় দুর্গতি আর হতেই পারে না যে, তার মধ্যে বসবাসকারী এক ব্যক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করে বিলাসী জীবন যাপন করবে এবং তারই পরিবারের সদস্য তার নিজের জ্ঞাতি ভাইয়েরা ভাত-কাপড়ের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকবে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গণ্য করে এবং এ ক্ষেত্রে এ মূলনীতি পেশ করে যে, প্রত্যেক পরিবারের গরীব ব্যক্তিবর্গের প্রথম অধিকার হয় তাদের পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর, তারপর অন্যদের ওপর তাদের অধিকার আরোপিত হয়। আর প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রথম অধিকার আরোপিত হয় তাদের গরীব আত্মীয়-স্বজনদের, তারপর অন্যদের অধিকার তাদের ওপর আরোপিত হয়। এ কথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই বিভিন্ন হাদীসে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথম অধিকার তার পিতামাতার, তারপর স্ত্রী-সন্তানদের, তারপর ভাই-বোনদের, তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর এবং তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর। এ নীতির ভিত্তিতেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ইয়াতীম শিশুর চাচাত ভাইদেরকে তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি অন্য একজন ইয়াতীমের পক্ষে ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যদি এর কোন দূরতম আত্মীয়ও থাকতো তাহলে আমি তার ওপর এর লালন পালনের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিতাম। অনুমান করা যেতে পারে, যে সমাজের প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তি (Unit) এভাবে নিজেদের ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেয় সেখানে কতখানি অর্থনৈতিক

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোন অংগীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলাটির মত না হয়ে যায় যে নিজ পরিশ্রমে সূতা কাটে এবং তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।[৯০] তোমরা নিজেদের কসমকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়ারে পরিণত করে থাকো, যাতে এক দল অন্য দলের তুলনায় বেশী ফায়দা হাসিল করতে পারো। অথচ আল্লাহ এ অংগীকারের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।[৯১] আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদের সমস্ত মত–বিরোধের রহস্য উন্মোচিত করে দেবেন।[৯২]

সচ্ছলতা, কেমন ধরনের সামাজিক মাধুর্য এবং কেমনতর নৈতিক ও চারিত্রিক পূতঃ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

৮৯. ওপরের তিনটি সৎ কাজের মোকাবিলায় আল্লাহ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। এ অসৎকাজগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গকে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সমগ্র সমাজ পরিবেশকে খারাপ করে দেয়।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে অশ্লীলতা–নির্লজ্জতা (فحشاء) । সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তরভুক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। তাকেই বলা হয় অশ্লীলতা। যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, উলংগতা, সমকামিতা, মুহাররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্ব সমক্ষে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা–নির্লজ্জতার অন্তরভুক্ত। যেমন মিথ্যা

প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোপন অপরাধ জন সমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারী–পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদের শারীরিক অংগভংগীর প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুষ্কৃতি (منكر) । এর অর্থ হচ্ছে এমন সব অসৎ কাজ যেগুলোকে মানুষ সাধারণভাবে খারাপ মনে করে থাকে, চিরকাল খারপ বলে আসছে এবং আল্লাহর সকল শরীয়াত যে কাজ করতে নিষেধ করেছে।

তৃতীয় জিনিসটি জুলুম–বাড়াবাড়ি (بغى) । এর মানে হচ্ছে, নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার তা আল্লাহর হোক বা বান্দার হোক লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা।

৯০. এখানে পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের অংগীকারকে তাদের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করে সেগুলো মেনে চলার হুকুম দেয়া হয়েছে। এক, মানুষ আল্লাহর সাথে যে অংগীকার করেছে। এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। দুই, একজন বা একদল মানুষ অন্য একজন বা একদল মানুষের সাথে যে অংগীকার করেছে। এর ওপর আল্লাহর কসম খেয়েছে। অথবা কোন না কোনভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিজের কথার দৃঢ়তাকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ। তিন, আল্লাহর নাম না নিয়ে যে অংগীকার করা হয়েছে। এর গুরুত্ব উপরের দু' প্রকার অংগীকারের পরবর্তী পর্যায়ের। তবে উল্লিখিত সব কয়টি অংগীকারই পালন করতে হবে এবং এর মধ্য থেকে কোনটি ভেঙে ফেলা বৈধ নয়।

৯১. এখানে বিশেষ করে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অংগীকার ভংগের নিন্দা করা হয়েছে। এ ধরনের অংগীকার ভংগ দুনিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ পর্যায়ের বড় বড় লোকেরাও একে সৎ কাজ মনে করেই করে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বাহ্‌বা কুড়ায়। জাতি ও দলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রায়ই এমনটি হতে দেখা যায়। এক জাতির নেতা এক সময় অন্য জাতির সাথে একটি চুক্তি করে এবং অন্য সময় শুধুমাত্র নিজের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তা প্রকাশ্যে ভংগ করে অথবা পর্দান্তরালে তার বিরুদ্ধাচরণ করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সত্যনিষ্ঠ বলে যারা পরিচিত, তারাই সচরাচর এমনি ধরনের কাজ করে থাকে। তাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে শুধু যে সমগ্র জাতির মধ্য থেকে কোন নিন্দাবাদের ধ্বনি ওঠে না তা নয় বরং সব দিক থেকে তাদেরকে বাহ্‌বা দেয়া হয় এবং এ ধরনের ঠগবাজী ও ধূর্তামীকে পাকাপোক্ত ডিপ্লোমেসী মনে করা হয়। আল্লাহ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, প্রত্যেকটি অংগীকার আসলে অংগীকারকারী ব্যক্তি ও জাতির চরিত্র ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা স্বরূপ। যারা এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

৯২. অর্থাৎ যেসব মতবিরোধের কারণে তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে সেগুলোর ব্যাপারে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তার ফায়সালা তো কিয়ামতের দিন হবে। কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং তার প্রতিপক্ষ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۭ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْۗءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

যদি (তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ না হোক) এটাই আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করতেন।[৯৩] কিন্তু তিনি যাকে চান গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেন এবং যাকে চান সরল সঠিক পথ দেখান।[৯৪] আর অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(আর হে মুসলমানরা!) তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পরস্পরকে ধোকা দেবার মাধ্যমে পরিণত করো না। কোন পদক্ষেপ একবার দৃঢ় হবার পর আবার যেন পিছলে না যায় এবং তোমরা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছো এই অপরাধে যেন তোমরা অশুভ পরিণামের সম্মুখীন না হও এবং কঠিন শাস্তি ভোগ না করো।[৯৫]

পুরোপুরি গোমরাহ ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তার জন্য কখনো কোনভাবে নিজের গোমরাহ প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অংগীকার ভংগ, মিথ্যাচার ও প্রতারণার অস্ত্র ব্যবহার করা বৈধ হতে পারে না। যদি সে এ পথ অবলম্বন করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য প্রমাণিত হবে। কারণ সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতা কেবলমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই সত্যবাদিতার দাবী করে না বরং কর্মপদ্ধতি ও উপায় উপকরণের ক্ষেত্রেও সত্য পথ অবলম্বন করতে বলে। বিশেষ করে যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রায়ই এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাকে যে, তারা যেহেতু আল্লাহর পক্ষের লোক এবং তাদের বিরোধী পক্ষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তাই সম্ভাব্য যেকোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অধিকার তাদের রয়েছে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এখানে একথা বলা হচ্ছে। তারা মনে করে থাকে, আল্লাহর অবাধ্য লোকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় সততা ও বিশ্বস্ততার পথ অবলম্বন এবং অংগীকার পালনের কোন প্রয়োজন পড়ে না, এটা তাদের অধিকার। আরবের ইহুদীরাও ঠিক একথাই বলতো। তারা বলতো لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের হাত পা কোন বিধি–নিষেধের শৃংখলে বাঁধা নেই। তাদের সাথে সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করা যেতে পারে। যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহর প্রিয় পাত্রদের স্বার্থ উদ্ধার এবং কাফেরদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

আল্লাহর অংগীকারকে[৯৬] সামান্য লাভের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না।[৯৭] যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা তোমাদের জন্য বেশী ভাল, যদি তোমরা জানতে। তোমাদের কাছে যা কিছু আছে খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে[৯৮] তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো[৯৯] এবং (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।[১০০]

তা অবলম্বন করা সম্পূর্ণ বৈধ। এ জন্য তাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না বলে তারা মনে করতো।

৯৩. এটা পূর্ববর্তী বক্তব্যের আরো একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ নিজেকে আল্লাহর পক্ষের লোক মনে করে ভাল-মন্দ উভয় পদ্ধতিতে নিজের ধর্মের (যাকে সে আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম মনে করছে) প্রসার এবং অন্যের ধর্মকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে তার এ প্রচেষ্টা হবে সরাসরি আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বিরোধী। কারণ মানুষের ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে যদি সমস্ত মানুষকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একটি ধর্মের অনুসারী বানানোই আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ জন্য আল্লাহর নিজের "তথাকথিত" পক্ষের লোকদের লেলিয়ে দেয়ার এবং তাদের নিকৃষ্ট অস্ত্রের সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ কাজ তো তিনি নিজের সৃজনী ক্ষমতার মাধ্যমে করতে পারতেন। তিনি সবাইকে মুমিন ও অনুগত হিসেবে সৃষ্টি করতেন এবং তাদের থেকে কুফরী ও গোনাহ করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেন। এরপর ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে একচুল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতা কারো থাকতো না।

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই মানুষকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় মানুষদের পথ বিভিন্ন। কেউ গোমরাহীর দিকে যেতে চায় এবং আল্লাহ গোমরাহীর

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾

তারপর যখন তোমরা কুরআন পড়ো তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর শরণ নিতে থাকো।[১০১] যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে তাদের ওপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য ও প্রতিপত্তি চলে তাদের ওপর যারা তাকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নেয় এবং তার প্ররোচনায় শিরক করে।

সমস্ত উপকরণ তার জন্য তৈরী করে দেন। কেউ সত্য–সঠিক পথের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহ তাকে সঠিক পথনির্দেশনা দানের ব্যবস্থা করেন।

৯৫. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একবার ইসলামের সত্যতা মেনে নেবার পর নিছক তোমাদের অসৎ আচরণের কারণে এ দীন থেকে সরে যাবে এবং মুমিনদের দলের অন্তরভুক্ত হতে সে শুধুমাত্র এ জন্য বিরত থাকবে যে, যাদের সাথে তার ওঠাবসা হয়েছে তাদেরকে সে আচার–আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কাফেরদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর পায়নি।

৯৬. অর্থাৎ যে অংগীকার তোমরা করেছো আল্লাহর নামে অথবা আল্লাহর দীনের প্রতিনিধি হিসেবে।

৯৭. এর অর্থ এ নয় যে, বড় লাভের বিনিময়ে তা বিক্রি করতে পারো। বরং এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার যে কোন লাভ বা স্বার্থ আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকারের তুলনায় সামান্যতম মূল্যের অধিকারী। তাই ঐ তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে এ মূল্যবান সম্পদটি বিক্রি করা যে কোন অবস্থায়ই ক্ষতির ব্যবসায় ছাড়া আর কিছুই নয়।

৯৮. "সবরের পথ অবলম্বন কারীদেরকে" অর্থাৎ এমন সব লোকদেরকে যারা সকল প্রকার লোভ–লালসা ও কামনা–বাসনার মোকাবিলায় সত্য ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ দুনিয়ায় সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা সবই যারা বরদাশ্‌ত করে নেয়। দুনিয়ায় অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে যেসব লাভ পাওয়া যেতে পারে তা সবই যারা দূরে নিক্ষেপ করে। যারা ভাল কাজের সুফল লাভ করার জন্য সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে, যে সময়টি বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসান ঘটার পর অন্য জগতে আসবে।

৯৯. এ আয়াতে মুমিন ও কাফের উভয় দলের এমন সব সংকীর্ণচেতা ও বেসবর লোকদের ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে, যারা মনে করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতার পথ অবলম্বন করলে মানুষের পরকালে সাফল্য অর্জিত হলেও তার পার্থিব জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের জবাবে আল্লাহ বলছেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে শুধু পরকালীন জীবনই সুগঠিত হয় না, দুনিয়াবী জীবনও সুখী সমৃদ্ধিশালী হয়। যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার, পবিত্র–পরিচ্ছন্ন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও সৎ তাদের পার্থিব জীবন ও বেঈমান ও অসৎকর্মশীল লোকদের তুলনায় সুস্পষ্টভাবে ভাল ও উন্নত হয়। নিজেদের নিষ্কলংক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রকৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন তা অন্যেরা লাভ করতে পারে না। যেসব পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও উত্তম সাফল্য তারা লাভ করে থাকেন তাও অন্যেরা লাভ করতে পারে না। কারণ অন্যদের প্রতিটি সাফল্য হয় নোংরা ও ঘৃণিত পদ্ধতি অবলম্বনের ফসল। সৎলোকেরা ছেঁড়া কাঁথায় শয়ন করেও যে মানসিক প্রশান্তি ও চিন্তার স্থৈর্য লাভ করেন তার সামান্যতম অংশও প্রাসাদবাসী বেঈমান দুষ্কৃতিকারী লাভ করতে পারে না।

১০০. আখেরাতে তাদের মর্যাদা তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছোট বড় সব রকমের সৎকাজ করে থাকবে তাকে তার সবচেয়ে বড় সৎকাজের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতম মর্যাদা দান করা হবে।

১০১. এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, মুখে শুধুমাত্র أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ উচ্চারণ করলেই হয়ে যাবে। বরং এ সংগে কুরআন পড়ার সময় যথার্থই শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার বাসনা পোষণ করতে হবে এবং কার্যত তার প্ররোচনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ভুল ও অনর্থক সন্দেহ–সংশয়ে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কুরআনের প্রত্যেকটি কথাকে তার সঠিক আলোকে দেখতে হবে এবং নিজের মনগড়া মতবাদ বা বাইর থেকে আমদানী করা চিন্তার মিশ্রণে কুরআনের শব্দাবলীর এমন অর্থ করা যাবে না যা আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই সংগে মানুষের মনে এ চেতনা এবং উপলব্ধিও জাগ্রত থাকতে হবে যে, মানুষ যাতে কুরআন থেকে কোন পথনির্দেশনা লাভ করতে না পারে সে জন্যই শয়তান সবচেয়ে বেশী তৎপর থাকে। এ কারণে মানুষ যখনি এ কিতাবটির দিকে ফিরে যায় তখনি শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার এবং পথনির্দেশনা লাভ থেকে বাধা দেবার এবং তাকে ভুল চিন্তার পথে পরিচালিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তাই এ কিতাবটি অধ্যয়ন করার সময় মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে যাতে শয়তানের প্ররোচনা ও সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের কারণে সে এ হেদায়াতের উৎসটির কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। কারণ যে ব্যক্তি এখান থেকে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারেনি সে অন্য কোথা থেকেও সৎপথের সন্ধান পাবে না। আর যে ব্যক্তি এ কিতাব থেকে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস তাকে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এ আয়াতটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এমনসব আপত্তির জবাব দেয়া হচ্ছে যেগুলো মক্কার মুশরিকরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে উথাপন করতো। তাই প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ বলা

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

১৪ রুকূ'

যখন আমি একটি আয়াতের জায়গায় অন্য একটি আয়াত নাযিল করি—আর আল্লাহ ভাল জানেন তিনি কি নাযিল করবেন—তখন এরা বলে, তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা কর।[১০২] আসলে এদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুস ঠিক ঠিকভাবে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে,[১০৩] যাতে মুমিনদের ঈমান সুদৃঢ় করা যায়,[১০৪] অনুগতদেরকে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সোজা পথ দেখানো যায়[১০৫] এবং তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দান করা যায়।[১০৬]

হয়েছে, কুরআনকে তার যথার্থ আলোকে একমাত্র সেই ব্যক্তিই দেখতে পারে যে শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে সজাগ–সতর্ক থাকে এবং তা থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। অন্যথায় শয়তান কখনো সোজাসুজি কুরআন ও তার বক্তব্যসমূহ অনুধাবন করার সুযোগ মানুষকে দেয় না।

১০২. এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত নাযিল করার অর্থ একটি হুকুমের পরে অন্য একটি হুকুম পাঠানোও হতে পারে। কারণ কুরআন মজীদের বিধানগুলো পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে এবং বহুবার একই ব্যাপারে কয়েক বছর পরপর ধারাবাহিকভাবে, একটি করে, দুটি করে বা তিনটি করে হুকুম পাঠানো হয়েছে। যেমন মদের ব্যাপারে বা যিনার শাস্তির ব্যাপারে ঘটেছে। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে আমি ইতস্তত করছি এ জন্য যে, সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতটি মক্কী যুগে নাযিল হয়। আর যতদূর আমি জানি সে সময় নাযিলকৃত বিধিসমূহে এ পর্যায়ক্রমিক ধারা অবলম্বনের কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাই আমি এখানে "এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত নাযিল করা"র অর্থ এই মনে করি যে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে কখনো একটি বিষয়বস্তুকে একটি উপমা বা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে আবার কখনো ঐ একই বিষয়বস্তু বুঝাবার জন্য অন্য একটি দৃষ্টান্ত বা উপমার সাহায্য নেয়া হয়েছে। একই কাহিনী বারবার এসেছে এবং প্রত্যেক বারই তাকে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি বিষয়ের কখনো একটি দিক পেশ করা হয়েছে এবং কখনো সেই একই বিষয়ের অন্য একটি দিক সামনে আনা হয়েছে। একটি কথার জন্য কখনো একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে আবার কখনো পেশ করা হয়েছে অন্য

একটি যুক্তি। একটি কথা এক সময় সংক্ষেপে বলা হয়েছে এবং অন্য সময় বলা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নাউযুবিল্লাহ, নিজেই এ কুরআন রচনা করেন বলে মক্কার কাফেররা যে কথা বলতো—এ জিনিসটিকেই তারা তার প্রমাণ গণ্য করতো। তাদের যুক্তি ছিল, আল্লাহর জ্ঞান যদি এ বাণীর উৎস হতো, তাহলে সব কথা একই সংগে বলে দেয়া হতো। আল্লাহ তো মানুষের মত অপরিপক্ক ও কম জ্ঞানের অধিকারী নন। কাজেই তিনি কেন চিন্তা করে করে কথা বলবেন, ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তথ্য জ্ঞান লাভ করতে থাকবেন এবং একটি কথা সঠিকভাবে খাপখেয়ে না বসতে পারলে অন্য এক পদ্ধতিতে কথা বলবেন? তোমার এ বাণীর মধ্যে তো মানবিক জ্ঞানের দুর্বলতা ধরা পড়ছে।

১০৩. "রূহুল কুদুস" এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'পবিত্র রূহ' বা 'পবিত্রতার রূহ।' পারিভাষিকভাবে এ উপাধিটি দেয়া হয়েছে হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালামকে। এখানে অহী বাহক ফেরেশতার নাম না নিয়ে তার উপাধি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদেরকে এ সত্যটি জানানো যে, এমন একটি রূহ এ বাণী নিয়ে আসছেন যিনি সকল প্রকার মানবিক দুর্বলতা ও দোষ–ত্রুটি মুক্ত। তিনি এমন পর্যায়ের অবিশ্বস্ত নন যে, আল্লাহ যা পাঠান, তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে অন্য কিছু মিশিয়ে দিয়ে তাকে অন্য কিছু বানিয়ে দেন। তিনি কোন দুরভিসন্ধিকারী বা কুচক্রী নন যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে ধোকাবাজী ও প্রতারণার আশ্রয় নেবেন। তিনি একটি নিখাদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রূহ। আল্লাহর কালাম পূর্ণ আমানতদারীর সাথে পৌছিয়ে দেয়াই তাঁর কাজ।

১০৪. অর্থাৎ তার পর্যায়ক্রমে এ বাণী নিয়ে আসার এবং একই সময় সবকিছু না নিয়ে আসার কারণ এ নয় যে, আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে, যেমন তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বুঝে নিয়েছো। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বোধশক্তি ও গ্রহণ শক্তির মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে একই সংগে সে সমস্ত কথা বুঝতে পারে না এবং একই সময় বুঝানো সমস্ত কথা তার মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূলও হতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ আপন প্রজ্ঞা বলে এ ব্যবস্থা করেন যে, রূহুল কুদুস এ কালামকে সামান্য সামান্য করে আনবেন। কখনো সংক্ষেপে আবার কখনো বিস্তারিত বর্ণনার আশ্রয় নেবেন। কখনো এক পদ্ধতিতে বুঝাবেন আবার কখনো অন্য পদ্ধতিতে। কখনো এক বর্ণনা রীতি অবলম্বন করবেন আবার কখনো অবলম্বন করবেন অন্য বর্ণনা রীতি। একই কথাকে বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করবে, যাতে বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন সত্যানুসন্ধানীরা ঈমান আনতে পারে এবং ঈমান আনার পর তাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রত্যয়, বোধ ও দৃষ্টি পাকাপোক্ত হতে পারে।

১০৫. এটি হচ্ছে এ পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রমের দ্বিতীয় উপযোগিতা ও স্বার্থকতা। অর্থাৎ যারা ঈমান এনে আনুগত্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে তাদেরকে ইসলামী দাওয়াতের কাজে এবং জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে যে সময় যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হবে তা যথা সময়ে দেয়া হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, ঠিক সময়ের আগে তাদেরকে এ পথনির্দেশনা দেয়া সংগত হতে পারে না এবং একই সংগে সমস্ত পথনির্দেশনা দেয়া তাদের জন্য উপকারীও হবে না।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়।[১০৭] অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়। আর এটি হচ্ছে পরিষ্কার আরবী ভাষা। আসলে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মানে না আল্লাহ কখনো তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার সুযোগ দেন না এবং এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (নবী মিথ্যা কথা তৈরী করে না বরং) মিথ্যা তারাই তৈরী করছে যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ মানে না,[১০৮] তারাই আসলে মিথ্যেবাদী।

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, (তাকে যদি) বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের ওপর নিশ্চিন্ত থাকে (তাহলে তো ভাল কথা), কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণ মানসিক তৃপ্তিবোধ ও নিশ্চিন্ততা সহকারে কুফরীকে গ্রহণ করে নিয়েছে তার ওপর আল্লাহর গযব আপতিত হয় এবং এ ধরনের সব লোকদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[১০৯]

১০৬. এটি হচ্ছে তার তৃতীয় স্বার্থকতা। অর্থাৎ অনুগতদের যেসব বাধা বিপত্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেভাবে তাদেরকে নির্যাতন করা ও কষ্ট দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে সমস্যা ও সংকটের যেসব পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সবের কারণে বারবার সুসংবাদের মাধ্যমে তাদের হিম্মত ও সাহস বাড়ানো এবং শেষ পরিণতিতে তাদেরকে সুনিশ্চিত সফলতার আশ্বাস দেয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যাতে তারা আশাদীপ্ত হতে পারে এবং হতাশ ও বিষণ্ন বদনে তাদের দিন কাটাতে না হয়।

১০৭. হাদীসে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মক্কার কাফেররা তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে এ ধারণা করতো। এক হাদীসে তার নাম বলা হয়েছে 'জাবার।' সে ছিল আমের আল হাদ্‌রামীর রোমীয় ক্রীতদাস। অন্য এক হাদীসে খুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্‌যার এক গোলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার নাম ছিল 'আইশ বা ইয়া'ঈশ। তৃতীয় এক হাদীসে ইয়াসারের নাম নেয়া হয়েছে। তার ডাকনাম ছিল আবু ফুকাইহাহ্। সে ছিল মক্কার এক মহিলার ইহুদী গোলাম। অন্য একটি হাদীসে বাল্‌'আন বা বাল্‌'আম নামক এক রোমীয় গোলামের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা এদের মধ্য থেকে যেই হোক না কেন, মক্কার কাফেররা শুধুমাত্র এক ব্যক্তি তাওরাত ও ইন্‌জীল পড়ে এবং তার সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতও হয়েছে শুধুমাত্র এটা দেখেই নিসংকোচে এ অপবাদ তৈরী করে ফেললো যে, আসলে এ ব্যক্তিই এ কুরআন রচনা করছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের পক্ষ থেকে এটিই পেশ করছেন। এ থেকে নবী করীমের (স) বিরোধিরা তাঁর ওপর দোষারোপ করার ব্যাপারে কত নির্লজ্জ নির্ভীক ছিল, কেবল তাই অনুমিত হয় না বরং নিজেদের সমকালীনদের মূল্য ও মর্যাদা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মানুষ যে কতটা ন্যায়নীতিহীন ও ইনসাফ বিবর্জিত হয়ে থাকে সে শিক্ষাও পাওয়া যায়। তাদের সামনে ছিল মানব ইতিহাসের এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব যার নজির সে সময় সারা দুনিয়ায় কোথাও ছিল না এবং আজ পর্যন্তও কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধরা সামান্য কিছু তাওরাত ও ইনজীল পড়তে পারতো এমন একজন অনারব গোলামকে এ মহান ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় যোগ্যতর বিবেচনা করছিল। তারা ধারণা করছিল, এ দুর্লভ রত্নটি ঐ কয়লা খণ্ড থেকেই দ্যুতি লাভ করছে।

১০৮. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে "মিথ্যা তো তারাই তৈরী করে যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না।"

১০৯. এ আয়াতে এমন সব মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যাদের ওপর সে সময় কঠোর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল এবং যাদেরকে অসহনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা যদি কখনো জুলুম–নিপীড়নের চাপে বাধ্য হয়ে নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করো এবং তোমাদের অন্তর কুফরী আকীদা মুক্ত থাকে তাহলে তোমাদের মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি অন্তরে তোমরা কুফরী গ্রহণ করে নিয়ে থাকো তাহলে দুনিয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলেও আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

এর অর্থ এ নয় যে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী কথা বলা বাঞ্ছনীয়। বরং এটি নিছক একটি "রুখ্‌সাত" তথা সুবিধা দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি অন্তরে ঈমান অক্ষুণ্ন রেখে মানুষ বাধ্য হয়ে এ ধরনের কথা বলে তাহলে তাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। অন্যথায় 'আযীমাত' তথা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ঈমানের পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষের এ রক্তমাংসের শরীরটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে যেন সত্যের বাণীরই ঘোষণা দিয়ে যেতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এ উভয় ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায়। একদিকে আছেন খাব্বাব ইবনে আরৃত (রা) তাঁকে জ্বলন্ত অংগারের ওপর শোয়ানো হয়। এমনকি তাঁর শরীরের চর্বি গলে

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾

এটা এ জন্য যে, তারা আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি এমনসব লোককে মুক্তির পথ দেখান না যারা তাঁর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। এরা হচ্ছে এমনসব লোক যাদের অন্তর, কান ও চোখের ওপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। এরা গাফলতির মধ্যে ডুবে গেছে। নিসন্দেহে আখেরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত[১১০] পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, (ঈমান আনার কারণে) যখন তারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা বাড়িঘর ত্যাগ করেছে, হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করেছে এবং সবর করেছে,[১১১] তাদের জন্য অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

পড়ার ফলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু এরপরও তিনি দৃঢ়ভাবে ঈমানের ওপর অটল থাকেন। বিলাল হাবশীকে (রা) লোহার বর্ম পরিয়ে দিয়ে কাঠফাটা রোদে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। তারপর উত্তপ্ত বালুকা প্রান্তরে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর দিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ উচ্চারণ করে যেতেই থাকেন। আর একজন সাহাবী ছিলেন হাবীব ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা)। মুসাইলামা কায্‌যাবের হুকুমে তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি অংগ–প্রত্যংগ কাটা হচ্ছিল এবং সেই সাথে মুসাইলামাকে নবী বলে মেনে নেবার জন্য দাবী করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি তার নবুওয়াত দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করছিলেন। এভাবে ক্রমাগত অংগ–প্রত্যংগ কাটা হতে হতেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। অন্যদিকে আছেন আম্মার (রা) ইবনে ইয়াসির (রা)। আম্মারের (রা) চোখের সামনে তাঁর পিতা ও মাতাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিয়ে শহীদ করা হয়। তারপর তাঁকে এমন কঠিন অসহনীয় শাস্তি দেয়া হয় যে, শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি কাফেরদের চাহিদা মত সবকিছু বলেন। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন এবং আরয করেন ঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تُرِكْتُ حَتّٰى سَبَبْتُكَ وَذَكَرْتُ اٰلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ

"হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে মন্দ এবং তাদের উপাস্যদেরকে ভাল না বলা পর্যন্ত তারা আমাকে ছেড়ে দেয়নি।"

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

১৫ রুকূ'

(এদের সবার ফায়সালা সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে আর কারো প্রতি সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।

*আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দেন। সেটি শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন যাপন করছিল এবং সবদিক দিয়ে সেখানে আসছিল ব্যাপক রিযিক, এ সময় তার অধিবাসীরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করলো। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করালেন এভাবে যে, ক্ষুধা ও ভীতি তাদেরকে গ্রাস করলো। তাদের কাছে তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন রসূল এলো। কিন্তু তারা তাকে অমান্য করলো। শেষ পর্যন্ত আযাব তাদেরকে পাকড়াও করলো, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল।*১১২

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ? "তোমার মনের অবস্থা কি?" জবাব দিলেন, مُطْمَئِنًّا بِالْاِيْمَانِ "ঈমানের ওপর পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত।" একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ اِنْ عَادُوْا فَعُدْ "যদি তারা আবারো এ ধরনের জুলুম করে তাহলে তুমি তাদেরকে আবারো এসব কথা বলে দিয়ো।"

১১০. যারা সত্যের পথ কঠিন দেখে ঈমান থেকে ফিরে গিয়েছিল এবং তারপর নিজেদের কাফের ও মুশরিক জাতির সাথে মিশে গিয়েছিল তাদের জন্য এ বাক্যাংশটি বলা হয়েছে।

১১১. এখানে হাবশার (ইথিয়োপিয়া) মুহাজিরদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

কাজেই হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের যা কিছু পাক-পবিত্র ও হালাল রিযিক দিয়েছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো,[১১৩] যদি তোমরা সত্যিই তাঁর বন্দেগী করতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকো [১১৪] আল্লাহ যা কিছু তোমাদের ওপর হারাম করেছেন তা হচ্ছে ঃ মৃতদেহ, রক্ত, শূয়োরের গোশ্‌ত এবং যে প্রাণীর ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাম নেয়া হয়েছে। তবে যদি কেউ আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছা পোষণ না করে অথবা প্রয়োজনের সীমা না ছাড়িয়ে ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে এসব খেয়ে নেয় তাহলে নিশ্চিতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১১৫] আর এই যে, তোমাদের কন্ঠ ভূয়া হুকুম জারী করে বলতে থাকে এটি হালাল এবং ওটি হারাম, এভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না।[১১৬] যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনোই সফলকাম হবে না। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ মাত্র কয়েকদিনের এবং পরিশেষে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১১২. এখানে যে জনপদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তাকে চিহ্নিত করা হয়নি। মুফাস্‌সিরগণও এ জনপদটির স্থান নির্দেশ করতে পারেননি। বাহ্যত ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি সঠিক মনে হয় যে, এখানে নাম না নিয়ে মক্কাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে এখানে ভীতি ও ক্ষুধা দ্বারা জনপদটির আক্রান্ত হবার যে কথা বলা হয়েছে সেটি হবে মক্কার দুর্ভিক্ষ, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত মক্কাবাসীদের ওপর জেঁকে বসেছিল।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

ইতিপূর্বে[১১৭] আমি তোমাকে যেসব জিনিসের কথা বলেছি সেগুলো আমি বিশেষ করে ইহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম।[১১৮] আর এটা তাদের প্রতি আমার জুলুম ছিল না বরং তাদের নিজেদেরই জুলুম ছিল, যা তারা নিজেদের ওপর করছিল। তবে যারা অজ্ঞতার কারণে খারাপ কাজ করেছে এবং তারপর তাওবা করে নিজেদের কাজের সংশোধন করে নিয়েছে, নিশ্চিতভাবেই তোমার রব তাওবা ও সংশোধনের পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১১৩. এ থেকে জানা যায়, ওপরে যে দুর্ভিক্ষের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এ সূরা নাযিলের সময় তা খতম হয়ে গিয়েছিল।

১১৪. অর্থাৎ যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর বন্দেগীর স্বীকৃতি দিয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো, তাহলে তোমরা নিজেরাই কোন জিনিসকে হালাল ও কোন জিনিসকে হারাম করার অধিকার গ্রহণ করো না। বরং যে রিযিককে স্বয়ং আল্লাহ হালাল ও পবিত্র ঘোষণা করেছেন তা খাও এবং তাঁর শোকর করো। আর যা কিছু আল্লাহর আইনে হারাম, অপবিত্র ও কলুষিত তা থেকে দূরে থাকো।

১১৫. এ হুকুমটি ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৩, সূরা মায়েদার ১৭৩ এবং সূরা আন'আমের ৩৫ আয়াতেও এসেছে।

১১৬. এ আয়াতটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, হালাল ও হারাম করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অথবা অন্য কথায়, একমাত্র আল্লাহই আইন প্রণেতা। অন্য যে ব্যক্তিই বৈধতা ও অবৈধতার ফায়সালা করার ধৃষ্টতা দেখাবে। সে নিজের সীমালংঘন করবে। তবে যদি সে আল্লাহর আইনকে অনুমতিপত্র হিসেবে মেনে নিয়ে তার ফরমানসমূহ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বলে, অমুক জিনিসটি অথবা কাজটি বৈধ এবং অমুকটি অবৈধ তাহলে তা হতে পারে। এভাবে নিজের হালাল ও হারাম করার স্বাধীন ক্ষমতাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ বলে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের বিধান তৈরী করে তার এ কাজটি দু'টি অবস্থার বাইরে যেতে পারে না। হয় সে দাবী করছে যে, যে জিনিসকে সে আল্লাহর কিতাবের অনুমোদন ছাড়াই বৈধ বা অবৈধ বলছে তাকে আল্লাহ বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ

নিজের হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে তার নিজের জীবনের শরীয়াত তৈরী করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুটি দাবীর মধ্য থেকে যেটিই সে করবে তা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাচার এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই হবে না।

১১৭. ওপরে উল্লেখিত হুকুমের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উথাপন করা হচ্ছিল তার জবাবে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। মক্কার কাফেরদের প্রথম আপত্তি ছিল ঃ তুমি যেসব জিনিস হালাল করে রেখেছো বনী ইসরাঈলদের শরীয়তে তো তেমনি ধরনের আরো বহু জিনিস হারাম হয়ে আছে। যদি ঐ শরীয়াতটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়ে থাকে তাহলে তুমি নিজেই তার বিরুদ্ধাচরণ করছো। যদি ঐ শরীয়াতটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়ে থাকে এবং তোমার শরীয়াতও আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে এ বিরোধ কেন? দ্বিতীয় আপত্তিটি ছিলঃ বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে শনিবারের সমস্ত দুনিয়াবী কাজ কারবার হারাম হবার যে আইনটি ছিল তাকেও তুমি উড়িয়ে দিয়েছো। এটা কি তোমার স্বেচ্ছাকৃত কাজ, না আল্লাহ নিজেই তাঁর দুটি শরীয়াতে দু' ধরনের পরস্পর বিরোধী হুকুম রেখেছেন?

১১৮. এখানে সূরা "আন'আম"–এর ১৪৬ আয়াত ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ج الايه

—এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ আয়াতে ইহুদীদের নাফরমানির কারণে বিশেষ করে কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল তা বলা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। সূরা নাহ্লের এ আয়াতে সূরা আন'আমের একটি আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, সূরা আন'আম এ সূরার আগে নাযিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সূরা আন'আমে এক জায়গায় বলা হয়েছে,

وَمَا لَكُمْ اَلاَّ تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ – (ایت : ١١٩)

এখানে সূরা নাহ্লের দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। কারণ মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে আন'আম ছাড়া এই একটিমাত্র সূরাতেই হারাম জিনিসগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, এর মধ্যে কোন্ সূরাটি আগে নাযিল হয়েছিল এবং কোন্টি পরে? আমাদের মতে এর সঠিক জবাব হচ্ছে এই যে, প্রথমে নাযিল হয়েছিল সূরা নাহ্ল। সূরা আন'আমের উপরোল্লিখিত আয়াতে এরই বরাত দেয়া হয়েছে। পরে কোন এক সময় মক্কার কাফেররা সূরা নাহ্লের এ আয়াতগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের ইতিপূর্বে বর্ণিত আপত্তিগুলো উথাপন করে। সে সময় সূরা আন'আম নাযিল হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে, আমরা পূর্বেই অর্থাৎ সূরা আন'আমে বলে এসেছি যে, ইহুদীদের জন্য কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে হারাম করা হয়েছিল। আর যেহেতু এ আপত্তি সূরা নাহ্লের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল তাই এর জবাবও সূরা নাহ্লেই প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ۚ وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰىهُ إِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَاٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

১৬ রুকূ'

প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম নিজেই ছিল একটি পরিপূর্ণ উম্মত,[১১৯] আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং একনিষ্ঠ। সে কখনো মুশরিক ছিল না। সে ছিল আল্লাহর নিয়ামতের শোকরকারী। আল্লাহ তাকে বাছাই করে নেন এবং সরল সঠিক পথ দেখান। দুনিয়ায় তাকে কল্যাণ দান করেন এবং আখেরাতে নিশ্চিতভাবেই সে সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হবে। তারপর আমি তোমার কাছে এ মর্মে অহী পাঠাই যে, একাগ্র হয়ে ইবরাহীমের পথে চলো এবং সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না।[১২০] বাকী রইলো শনিবারের ব্যাপারটি, সেটি আসলে আমি এমনসব লোকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা এর বিধানের মধ্যে মতবিরোধ করেছিল।[১২১] আর নিশ্চয়ই তারা যেসব ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তোমার রব কিয়ামতের দিন সেসব ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দেবেন।

১১৯. অর্থাৎ তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মতের সমান। যখন দুনিয়ায় কোন মুসলমান ছিল না তখন একদিকে তিনি একাই ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী এবং অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মানুষ ছিল কুফরীর পতাকাবাহী। আল্লাহর এ একক বান্দাই তখন এমন কাজ করেন যা করার জন্য একটি উম্মতের প্রয়োজন ছিল। তিনি এক ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান।

১২০. এটি হচ্ছে আপত্তিকারীদের প্রথম আপত্তিটির পূর্ণাংগ জবাব। এ জবাবের দু'টি অংশ। একটি হচ্ছে, আল্লাহর শরীয়াতে বৈপরীত্য নেই, যেমনটি তুমি ইহুদীদের ধর্মীয়

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও[১২২] এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।[১২৩] তোমার রবই বেশী ভাল জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।

আইন ও মুহাম্মাদী শরীয়াতের বাহ্যিক পার্থক্য দেখে ধারণা করেছো। বরং আসলে ইহুদীদেরকে বিশেষ করে তাদের নাফরমানীর কারণে কতিপয় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এ নিয়ামতগুলো থেকে অন্যদেরকে বঞ্চিত করার কোন কারণ ছিল না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে পদ্ধতি অনুসরণের হুকুম দেয়া হয় তা হচ্ছে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদ্ধতি, আর তোমরা জানো ইহুদীদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিল মিল্লাতে ইবরাহীমীর জন্য সেগুলো হারাম ছিল না। যেমন ইহুদীরা উটের গোশ্‌ত খায় না। কিন্তু মিল্লাতে ইবরাহীমীর জন্য এ গোশ্‌ত হালাল ছিল, ইহুদীদের শরীয়াতে উটপাখী, হাঁস, খরগোশ ইত্যাদি হারাম কিন্তু মিল্লাতে ইবরাহীমীতে এসব জিনিস হালাল ছিল। এ জবাবের সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকে এ মর্মেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের যেমন ইবরাহীমের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ইহুদীদের সাথেও নেই। কারণ তোমরা উভয় দলই শির্‌ক করছো। মিল্লাতে ইবরাহীমীর যদি কেউ সঠিক অনুসারী থেকে থাকে তবে তিনি হচ্ছেন এই নবী মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সংগী সাথীগণ। এদের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে শির্‌কের নামগন্ধও নেই।

১২১. এটি হচ্ছে মক্কার কাফেরদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাব। শনিবার ইহুদীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং ইবরাহীমী মিল্লাতে শনিবারের কোন ধারণাই ছিল না, একথা বলার এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ মক্কার কাফেররাও একথা জানতো। তাই এখানে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, ইহুদীদের আইনে তোমরা যে কঠোরতা দেখছো তা তাদের প্রাথমিক বিধানে ছিল না বরং পরবর্তীকালে ইহুদীদের দুষ্কৃতি এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণের কারণে তাদের ওপর এগুলো আরোপিত হয়েছিল। একদিকে বাইবেলের যেসব অধ্যায়ে শনিবারের বিধান বর্ণিত হয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন না করা (যেমন যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ৮-১১, ২৩ ঃ ১২ ও ১৩, ৩১ঃ ১২-১৭, ৩৫ ঃ ২ ও ৩, গণনা পুস্তক ১৫ ঃ ৩২-৩৬) এবং অন্যদিকে শনিবারের বিধি-নিষেধ ভাঙার জন্য ইহুদীরা যেসব অপচেষ্টা চালিয়েছিল সেগুলো না জানা পর্যন্ত (যেমন যিরমিয় ১৭ ঃ ২১-২৭

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম। হে মুহাম্মাদ! সবর অবলম্বন করো—আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সুযোগ দানের ফলমাত্র—এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।[১২৪]

এবং যিহিষ্কেল ২০ ঃ ১২–২৪) কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের এ ইংগিতগুলো ভালভাবে বুঝতে পারবেন না।

১২২. অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই, সদুপদেশ।

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের মত চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন–মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি নজর রেখে এবং এ সংগে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া যাবে না। যে কোন ব্যক্তি বা দলের মুখোমুখি হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে, তারপর এমন যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা করতে হবে যা তার মন–মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

সদুপদেশের দুই অর্থ হয়। এক, যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং তার আবেগ–অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে। দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাতিল করলে হবে না বরং মানুষের প্রকৃতিতে এসবের বিরুদ্ধে যে জন্মগত ঘৃণা রয়েছে তাকেও উদ্দীপিত করতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতির ভয় দেখাতে হবে। ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ শুধু যে ন্যায়সংগত ও মহৎ গুণ, তা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করলে চলবে না বরং সেগুলোর প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করতে হবে। দুই, উপদেশ এমনভাবে দিতে হবে যাতে আন্তরিকতা ও মংগলাকাংখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাকে উপদেশ দান করা হচ্ছে সে যেন একথা মনে না করে যে, উপদেশদাতা তাকে তাচ্ছিল্য

করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে। বরং সে অনুভব করবে উপদেশদাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাংখা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভাল চায়।

১২৩. অর্থাৎ এটি যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই ও মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। এ আলোচনায় পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্যবাণে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের গলাবাজী করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্য হবে না। বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ করতে হবে। যুক্তি–প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সংগত ও হৃদয়গ্রাহী। যাকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুঁয়েমী এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ না দেখা দেয়। সোজাসুজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, সে কূটতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছে তখনই তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যাতে ভ্রষ্টতার নোংরা কাঁদামাটি সে নিজের গায়ে আরো বেশী করে মেখে নিতে পারে।

১২৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে সব ধরনের খারাপ পথ থেকে দূরে থাকে এবং সর্বদা সৎকর্মনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্যেরা তাদের সাথে যতই খারাপ আচরণ করুক না কেন তারা দুষ্কৃতির মাধ্যমে তার জবাব দেয় না বরং জবাব দেয় সুকৃতির মাধ্যমে।